এদিক-ওদিক

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য

গল্প কয়টিতে জীবনের বিভিন্ন দিক দেখাবার চেষ্টা করেছি। কতোদূর সার্থক হয়েছি জানি না; চিন্তাশীল পাঠকদের অনুকূল অভিমতে সেগুলি ধন্য হয়ে উঠুক।

বন্ধুবর শ্রীঅনঙ্গ কুমার ভট্টাচার্য্যের চেষ্টায়ই এগুলি এতো সত্বর বের করা সম্ভব হয়েছে। তাকে যা দিতে চাই সেটা ধন্যবাদ নয়—ধন্যবাদেরো বেশি! শিখা সম্পাদক শ্যামাধন সেনগুপ্তও আমাকে নানাভাবে সাহায্য করে আমার ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। ইতি

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্য,

এদিক-ওদিক

জীবনে শরৎ এই প্রথম নয়, বহুবার এসেছে আর গেছেও বহুবার—তার স্বচ্ছ শুভ্র শেফালির ডালা নিয়ে। শেফালির পরিমল আর পবিত্র প্রকাশের মাঝে আনন্দ আছে সেটা বহুবার টের পেয়েছি যেমন আনন্দ আছে পূজার ছুটিতে আর মানুষের মুখের হাসিতে—তবে এবিষয়েও যে ভেবে দেখা চলে সেটা [illegible]য়নি, আর মন হতেও সেটা গেছে মুছে। তবু তা' মনের মাঝে কোন ছায়াই রাখেনি কি ?

আজো যখন শরৎ আসে শেফালির শুভ্র পরিমল নিয়ে, বহুবার ঘুরে আসা শরতের মধুময় স্মৃতি কি মনে জাগে না ? দ্রুত তা' মনে করিয়ে দেয় আগের কোন এক শরতের স্মৃতি যা' এসেছিল ঠিক আজিকার মতই প্রভাতের সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল হয়ে শেফালির পরিমলে বাতাসকে ভরে। অতি দ্রুত তা' মনকে নাড়া দিয়ে যায়—দিয়ে যায় এক অজানা আনন্দময় অনুভূতি, যেন তা জন্ম জন্ম ধরে আমার জীবনে আসছে আর আমার মনকে নাড়া দিচ্ছে—জন্ম জন্ম, যুগ যুগ ধরে! আর সে শরতের প্রভাত যেন এসেছিলো আমার জীবনে মস্ত এক বিপর্য্যয় নিয়ে—যা দিয়েছিলো আমার জীবনের সেরা যে আনন্দ তাই। আমি যেন সেদিন পেয়েছিলাম যা আমি চাই

—যুগ যুগান্তের আমার আকাঙ্ক্ষার ধন—যাকে আমি কামনা করে এসেছি আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে—এমনি মনে হয়! কিন্তু কি সে যা আমি পেয়েছিলাম আর কবে কোন শরতে? সে কি এ জন্মে, না পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি? কিংবা এ আমার মনের মিথ্যা কল্পনা মাত্র। কিন্তু তাই যদি হবে তো এমন করে আমার মনে হয় কেন—এ মনে হওয়ার কি-ই বা অর্থ থাকতে পারে? কে জানে কেন এ হয় তবু মনে যে হয় তাও সত্যি আর আনন্দ ও যে পাই, মনটা যে খুশি হয়ে উঠে এও সত্যি! মনের মিথ্যা কল্পনার চেয়ে এ আনন্দটাই কি বড়ো নয়? হোক না এ, কল্পনা, তবু তা' যদি আমার মনকে—আমার জীবনকে অজানা মিথ্যা একটা দিনের পাওয়ার আনন্দে ভরে তুলতে পারে, সেটা পূর্ব্বজন্মের না এ জন্মের জেনে আমার কি হবে? আমি পেয়েছিলাম—এ মিথ্যা সম্বলেরো আনন্দটুকুই কি যথেষ্ট নয়? এখানে বুদ্ধি দিয়ে বাঁচতে যাওয়া যে বিড়ম্বনা—মস্ত ক্ষতি; তার চেয়ে নির্বিচারে মেনে নেওয়ায় ঢের লাভ—ঢের আনন্দ!

এমনি এবার শরৎ এলো আমার জীবনে পূর্ব্বজন্মের না এ জীবনেরই একটুকরা আনন্দের স্মৃতি নিয়ে কে জানে,—তবে তা যে এলো এ সত্যি। মনটা খুশি হয়ে উঠলো!

এক ঝলক আনন্দের মাঝে ভাবতে বসেছি কি করা যায়। বন্ধুদের কেউ বা গেছে দার্জ্জিলিংএ—কেউ বা পুরী, কেউ বা শিলং অথবা অন্য স্বাস্থ্যাবাসে,—ছুটিতে বাঙালীর এ ভাঙা শরীর সারিয়ে নিতে! অন্য যারা তাদের মাঝেও কেউ বা গেছে

বাড়ী, কেউ বা কোন আত্মীয় বাড়ীতে পূজার আনন্দে ভাগ্ বসাতে, যারা যায়নি তারাও তোড়জোড়ে ব্যস্ত। আমি বসে ভাবছি আর মনে মনে ভাজছি—শরতে আজ কোন অতিথি— —বড় করে নয়, কেউ হঠাৎ শুনে ফেললে সমজদার ভাবতে কতক্ষণ!

এমন সময় রুক্মিণী এলো, আমতলির জমিদার সে; বললো—বাড়ী যাবি, পূজোয়?—

রুক্মিণী আমার বন্ধু, কলেজে এক্সঙ্গে পড়েছি। তাদের সঙ্গে জানাশোনাও আছে তবে তাদের গ্রামের বাড়ীতে যাইনি কোন দিন। সেখানে থাকেন তার বাবা, মা, ভাই, বোন—মস্তবড়ো পরিবার। পরিবারের অনেকের সঙ্গেই দেখা হয়েছে সহরের বাড়ীতে, তবে কেউই আমাকে চিনেন কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ প্রচুর; অবশ্য চিনেন না এও জোর করে বলা চলে না! আমি কিন্তু চিনি তাদের প্রায় সবাইকেই।

আমি উত্তর দিলুম,—নারে, এবার আর বাড়ী যাচ্ছি না,—গ্রামে বর্ষা লেগেই আছে, আর সে বর্ষার রূপতো দেখিসনি—আর যাই করুক তাতে মনটা কিন্তু টানে না ভাই, বরং তা বিরূপ হয়েই উঠে, ভরসা আর উৎসাহ এ দু'য়েরই অভাব অনুভব করি!—এমন আনন্দের দিনে গ্রামের কাদা, রোগ আর নোংরা লোক গুলোর কথা মনে পড়ায় হঠাৎ মনের সব আনন্দ নিভে এলো।

রুক্মিণী বললে,—সে কিন্তু ভাই সব গ্রামেই এক, তবু বাড়ী যাওয়ার টানতো অস্বীকার করতে পারি নে, আমি কিন্তু বাড়ী যাবো—আর বাড়ীর দিকে টানটাও আমার একটু বেশি নয় কি? তাইতো যখন খুশি বাড়ী যাই আর তা নিয়ে তোরা কি ঠাট্টাটাই না করিস—আমার কিন্তু সত্যি তাতে আনন্দই হয়! এই বাড়ীর জন্যিতো আমার কিছু হলো না!

বললাম,—তা' সত্যিই তো, পূজার সময় কি আর বাড়ী না গিয়ে পারা যায়? মনে মনে বললাম,—সে যাবে না কেন, সে হলো জমিদার—দশটা গ্রামের আনন্দ নিয়ে তার বাড়ীতে পূজো এসেছে,—বাড়ীতে রয়েছেন বাবা, মা, ভাই, বোন, আত্মীয় স্বজন,—সে সকলের মাঝে রয়েছে তারো আনন্দ মিশে। আর আমি?—আমার মতো হলে বাড়ী যাওয়ার উৎসাহটা তারো তখন থাকতো কোথায় দেখে নিতাম।

সে বললো—তা তুইও চল না আমাদের বাড়ী, তোর কোন অসুবিধেই হবে না, দেখে নিস।

মনে মনে ভাবলাম,—মন্দকি, তাদের গ্রামও দেখা যাবে আর তাদেরেও,—অসুবিধা যে হবে না সেটাও জানি। বললাম, —তাই ভালো, বরং তাই করা যাক—পূজোর দিন গুলো বেশ আরামেই কাটবে।

গেলুম তাদের বাড়ী। গ্রামের নাম আমতলি কিন্তু গ্রামটাকে আমের ছায়ায় ঘেরা মনে হলো না তো!

মস্তবড়ো বাড়ী। অনেক পুরানো বনেদি জমিদার ওরা। ও ধরণের বাড়ী আমি জীবনে একখানাও দেখিনি। চেপ্টা ইটে গাঁথা বড়ো বড়ো থাম—কতো বড়ো বলে বুঝানো সম্ভব নয়; মাঝে মাঝে কালো বড়ো বড়ো পাথর;—এতো বড়ো যে আমি ভাবতে লাগলাম ওরা এগুলো এই অজ পাড়াগাঁয়ে নিয়ে এলোই বা কি করে আর গাঁথলোই বা কারা? ওরা যে ছিলো ময়-দানবের বংশধর সে বিষয় আর সন্দেহই রইলো না! তবু সে ভাস্করদেরে দেখবার ইচ্ছা জাগে নাকি, আর সেই সঙ্গে অবাক হয়ে ভাবতে হয় অতীতের গৌরবময় যুগে ভারতের ভাস্কর্য্যের কথা! এতো আর কল কারখানায় নয়,—মানুষের বুকের পাঁজর ভেঙ্গে পুরুষানুক্রমে রক্ত দিয়ে তৈরি—বিশ বছরে, পঁচিশ বছরে, হয়তো বা তারো বেশি দিনে,—যেখানে তাজমহলকেও হার মানতে হয়েছে! এ যেন মহাকাব্য,—এপিক,—ছোট কবিতা নয়, পীরামিড—কিওপছ্! মনে হলো,—সে কোন যুগে এখানে এ বাড়ী তৈরি হয়েছে কে জানে, হয়তো নবাবের আমলে—হয়তো তারো আগে,—অনেক—অনেক আগে! আর এ বাড়ীর সঙ্গে গাঁথা রয়েছে কতো সুখ দুঃখ,—কতো জীবন মরণের কাহিনী,—অতীত ইতিহাসের ছেঁড়া একটুকরা পাতা! হয়তো এদের পূর্ব্বপুরুষেরা ছিলেন দুর্দ্দান্ত দস্যু, হাজার হাজার লোকের রক্তের বিনিময়ে তৈরি করেছিলেন এ প্রাসাদ—কিংবা বীর, ন্যায়পরায়ন জমিদার ও তো হতে পারেন! তবু সে ন্যায়-পরায়নতার স্বরূপটা কি ছিলো কে জানে? .....

হরনাথ বাবু রুক্মিনীর বাবা—বয়স হয়েছে। তাঁকে অনেক-বার দেখেছি কিন্তু আজ এ পরিবারের আবেষ্টনীর মাঝে তাকে মনে হলো বড়ো সুন্দর! দেখতে তিনি সুপুরুষ সন্দেহ নাই তবু এ আবেষ্টনীর মর্য্যাদায় তাঁকে আরো সুন্দর মনে হচ্ছে না কি?

বাড়ী প্রকাণ্ড, সামনে মস্তবড়ো দীঘি—তার উঁচু পরিসর পাড়—তার উপর মস্ত বড়ো বড়ো বটের আর তেঁতুলের গাছ—হয়তো হাজার হাজার বছর ধরে দাঁড়িয়ে আছে এখানকার জমি-দারীর,—সুখ দুঃখের মৌন সাক্ষী! তা'দের শিকড়গুলো বড়ো বড়ো, মাটি আঁকড়ে রাখতে পারেনি—মাটি থেকে অনেক উঁচুতে। আমের গাছ আছে—এতো প্রকাণ্ড যে অদ্ভুত লাগে! মস্ত বড়ো কাণ্ড—তারপর বড়ো বড়ো শাখা প্রশাখায় বিরাট ঝোপ,—এখানেই বোধ হয় আমতলি নামের সার্থকতা! যে দিকে চোখ পড়ে সব কিছুই বিরাট, বড়ো—যেন ভূমার সাধনা, চেয়ে দেখতে আরাম লাগে—মনে ভয়ও হয়, বিস্ময়ও জাগে আবার তা' খুশি হয়েও উঠে। এইতো অতীত ভারতের ইতিহাস —সে ইতিহাস যেন মানুষের নয়,—দৈত্যদানবের—বিরাটের —ভূমার। এই তো ভারতের সত্যিকারের রূপ!

হরনাথ বাবু আমাকে দেখেই বললেন,—এসো বাবা, তারপর তোমাদের এতো দেরি হলো যে!

রুক্মিনী বললো,—বাজার করতে গিয়ে মুস্কিলে পড়েছিলুম আর কি—এটা শেষ হয়তো ওটা বাকি রয়ে যায়,—আবার এক সঙ্গে মনেও পড়ে না ছাই—তাইতে দেরি হয়ে গেল!

আমি কিন্তু রুক্মিনীকে বাজার করতে দেখিনি। বাড়ীর লোক বাজার করেছে আর তাই নিয়ে তাকে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি—ছুঠাছুটি করেছে ও প্রচুর—তারি কাছে টাকা ছিল কি না! অসংখ্যবার বলতে শুনেছি—সে ভয়ানক ব্যস্ত—অসংখ্য কাজ—বাজার—সময় নেই!

হরনাথ বাবু তার মুখের দিকে চেয়ে শুধু একটু হাসলেন। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন,—তোমার কিন্তু ভয়ানক কষ্ট হবে বাবা, খোকার মুখে শুনেছি তোমার আবার যা কড়া-কড়ি নিয়ম। পূজায় একটু অনিয়ম হবে বই কি! তা' হোক তোমাকে নিজের সুবিধা অনেকটা নিজেই করে নিতে হবে—এ তো আর পরের বাড়ী নয়,—কে আর দেখবে, বল! তবু তুমি যে এসেছ তাতে আমি খুবই খুশি হয়েছি।

তাঁর কথায় এমন একটা পরিচিত অন্তরঙ্গতার আভাস পেলুম যে আমার মন খুশি হয়ে উঠলো, মনে হলো,—আমি তো তাদের অপরিচিত নই! তাদেরে দেখে বাস্তবিক আমার মনে হয়েছে,—এই এরাই যেন আমার যুগযুগান্তের পরিচিত! এদের সঙ্গে এক অবিচ্ছিন্ন রক্তধারায় আমি বাঁধা রয়েছি কতো কাল কে জানে? যেন ওদের সঙ্গে আমার যোগ রয়েছে,—কিন্তু তা কোথায়?

অতি পরিচিতের মতো তাদের সঙ্গে মিশে গেলাম।

তাঁদের সকলের কথা বলা সম্ভব নয়; আগেই বলেছি মস্তবড়ো পরিবার ওদের, আর সেটা বলারও আমার দিক থেকে কেনো প্রয়োজন নেই!

মানুষ দেখলাম অদ্ভুত আর আশ্চর্য্য হয়ে তাদের দিকে চেয়ে রইলাম—যেন আমার সাথে তাদের কোন মিলই নেই।

নিশ্চিন্ত নীরবতার ভেতর দিয়ে ওদের দিন কেটে যাচ্ছে—শৈথিল্যের আভিজাত্যে। বাইরে দ্রুততর জগৎ—কালের সঙ্গে তাল ঠুকে এগিয়ে যাচ্ছে—দিনের পর দিন আসছে—যাচ্ছে—সে যেন ওদের নয়। ওদের যেন কালের সাথে আড়ি—অনন্ত-কাল ধরে যেন বাঁচবে ওরা—মরবে না—বাঁচবার পরওয়ানা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে! ওদেরে দেখে করুণাও হয়—সম্ভ্রমও জাগে! ওদের যেন রাজারাজড়ার জীবন—অলস আভিজাত্যে ভরা। চিন্তাও ওদের আছে—যে চিন্তায় আমরা পাগল হয়ে যেতাম। কপাল ঠুকে চলছে ওরা বাস্তবকে এড়িয়ে—পাশ কাটিয়ে! বুভুক্ষা—মহামারী, অনাহার, দলাদলি, মোকদ্দমা—নীচতা! ওইতো জীবন—শিক্ষাহীন অপরিণত মনোবৃত্তি! এইতো আরামের সোনার বাংলা—পল্লীমায়ের নয়ন-মন-ভুলানো রূপ? সে রূপ মানুষের রূপ নয়,—কবির কল্পনার—মানুষকে বাদ দিয়ে আর সবকিছুরই! দূর হতে তা মনকে টানে—কাছে এলে মন অপবিত্র হয়ে উঠে!

এইতো মানুষ,—এদের সঙ্গে আমার যোগ কোথায়?

আরো কাছে গিয়ে দেখলাম; সেদিন সকাল বেলা! রুক্মিনীকে বললাম,—বেড়াতে যাবো—একেবারে গ্রামের ভেতর—দূরে—যতো দূর অবধি যাওয়া যায়।—যাবি তুই?

রুক্মিনী আশ্চর্য্য হয়ে বললো, —বলিস্ কি,—এই কাদার ভেতর হেটে তুই যাবি—এ উদ্ভট সখ কেন? তারপর আমার কাঁধের উপর হাত রেখে বললো,—জিনিষটা যতো সোজা ভাবছিস তা' নয়,—গ্রামের রূপতো তুই দেখিস নি!

মনে মনে বললাম,—তা দেখিনি সত্য, তাই তো যাবো। বুঝলাম—আমারি কথা সে আমাকে শুনিয়ে দিচ্ছে—চেয়ে দেখলাম সে হাসছে মৃদু!

বললাম তাকে,—সখটা আমার উদ্ভট তাতো জানিস্‌ই, আর আমি কি তোর কাদা আর গ্রামই দেখবো ভেবেছিস,—আমি যে দেখবো মানুষকে! —কথা আমার জানিয়ে দিলো যে আমি যাবোই, বাধা পেলে ঝোকটা আমার চড়ে কি না!

সে বললো,—তা' ভাই তুই যা—আমি কিন্তু একপাও নড়ছিনে—মানুষ আমি ঢের দেখেছি; সঙ্গে বরং লোক দিয়ে দিচ্ছি—

আমি বললাম,—নারে—সঙ্গে লোক দিতে হবে না—অমনি দেখিস ফিরে আসবো! পথ যে আমার হারায় না তাও তো জানিস।

সে বললো,—তুই ওই রকমই—বলে কি হবে—তা' যা' না!

চা খেয়ে বেরিয়ে গেলাম—ফিরে আসবো বারোটায়! পথ চলছি—মাঝে মাঝে জল—পায়ের নীচে কাদা—মাথার উপর রোদ! দুধারে গ্রাম একের পর এক চোখের উপর দিয়ে ভেসে

যাচ্ছে—খড়ের ঘর—মাঝে মাঝে দু' একখানা টিনের! এগিয়ে চললাম—আরো দূরে।

গ্রামের ভিতর দিয়ে চলেছি। দু'ধারে বাড়ী—মাঝে চলেছে পথ,—এঁকে বেঁকে নয়—সোজা দক্ষিণে! বাঁ দিকে চেয়ে দেখলাম, একটা ঘরের দাওয়ায় বসে একটি মেয়ে,—বয়স ছাব্বিশ সাতাশ। দেখতে মন্দ নয়,—গায়ের রঙ ফর্সা আর স্বাস্থ্যও ভাল! কোলে ছেলে, মায়ের বুক চুষে রস টেনে নিচ্ছে কি তৃপ্তির সহিত—শুভ্র নিটোল বুক যেন ফুলে উঠছে দুধের ভারে—দুলে উঠছে নিশ্বাসে নিশ্বাসে—আর তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। মাঝে মাঝে মার মুখে ছেলেটি তার বাঁ হাত দিয়ে দেখছে হয়তো কেমন লাগে—আর মার অনাবৃত পরিষ্কার শুভ্র নরম বুকের রস চুষে খাচ্ছে—চমৎকার! মনটা খুশি হয়ে উঠলো,—এইতো পল্লীমায়ের রূপ! মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম—কেমন করে ভাবে ওই মেয়েটি,—ওদের সুখ দুঃখ—ছেলে মেয়ে—ভালোবাসা—জীবনযাত্রা! ঠিক আমার পরিচিত বলে মনে হচ্ছে না কিন্তু কিছুটা আমেজ তার পাচ্ছি, আর মনটা সত্যি সত্যি খুশি হয়ে উঠছে ওদের কথা ভেবে! মেয়েটি কিন্তু আমার দিকে তাকিয়েও দেখলো না। তবু ওর চিন্তাধারার সঙ্গে হয়তো বা কিছুটা মিলও আছে আমার—নইলে এতো ভালো লাগবে কেন? ও কেমন করে ভাবে?……

পিপাসা পেয়েছে খুব,—একটানা দু'ঘণ্টা চলেছি। পথের ধারে গাছের ছায়ায় বসে পড়লাম। একটি ছেলে এলো, বয়স তেরো হবে। বললো,—বাবু ভিক্ষে দিন!

এ যেন তার দাবি, ছেলেটির মুখের দিকে তাকালুম !—কা'ল বাবা ভিক্ষে করে যা' এনেছিলো তাতে আমরা দু'ভাই আর এক বোনের আধপেটা হয়েছে,—বাবা মা কিছু খায়নি,—ছেলেটি বললো।

মনে মনে বললাম,—বাবা মায়ের যে সন্তান বাৎসল্য আছে সেটা মানি, নইলে লোকসংখ্যা এতো দ্রুত বাড়তো কি যে দেশে এক বেলা আহার জুটে না সে দেশে ?

ছেলেটি মুসলমান। যা' বললো তা'তে বুঝলাম যে জলে সব নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ফসল হয়নি! সরকার থেকে সাহায্য করা হচ্ছে আর ওই ছেলেটির বাবার ভাগ্যে একমুটো চাউলও জুটেনি —দু'দিন গিয়ে ফিরে এসেছে। মাঝে মাঝে কলেরাও হচ্ছে। সরকার থেকে সাহায্য করা হচ্ছে—কিন্তু কেন ? ওদেরে বাঁচিয়ে রাখতেই কি ?—মনে ভাবলাম।

ছেলেটিকে দেখলাম—না খেয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেছে। তার মুখের দিকে চেয়ে আমার কেমন ভালো লাগলো,—পকেটে কিছু খুচরো পয়সা ছিলো তাই তাকে দিলাম! দয়ায় নয় মোটেই—দয়া যে দুর্ব্বলতা! অনাহারে, দুর্ভিক্ষে কতো লোকইতো মরছে -ওরা মরবেই—তাতে আমার কি ? আর ভিক্ষা ?—সে তো আমাদের বৈশিষ্ট্য—দাবি যে আমাদের নেই! জোর—ক্ষমতা—ওসব আভিধানিক বড়ো বড়ো বুলি শুধু,—জীবনের সঙ্গে এর সম্বন্ধ কোথায় ? আমাদের পাওনা যেটা সেটা আমরা আদায় করি ভিক্ষা করে জোর করে নয়!

প্রভুর মুখে চেয়ে হাত পেতে দাঁড়িয়ে থাকি—মিলে যাবে! জোর,—কেড়ে নেওয়া?—কি অসভ্য নীচ মন!

সত্যি সভ্যতার বড়াই আমরা করতে পারি!—এই কি আমাদের আগাগোড়া দেশের রূপ নয়—ছোট বড়ো সবার—সব লোকের? ··· ···

আমার মনে হলো,—ওই ছেলেটীর সঙ্গে যেন আমার যোগ রয়েছে—রক্তের সম্বন্ধ—বহু শতাব্দির—ইচ্ছা করলেই তা ছিঁড়ে ফেলতে পারিনা তো! কিন্তু তা' কোথায়?

না, আর নয়! ফিরে এলুম—বুকের পিপাসা বুকেই রইলো। ফেরার পথে বারে বারে ওই ছেলেটির মুখ আমার মনে উঁকি মারতে লাগলো।

ফিরে এলে রুক্মিনী বললো—কিরে কি দেখলি?

বললাম,—মাত্র একটী ছেলে,—আর তারি মাঝে আমাকে।

সে আর কিছু বললো না।

আমি বললাম,—চলে যাবো ভাবছি দু'একদিনের ভেতরই—

মানুষের বাইরের সঙ্গে মনের মিল মোটেই নেই। বাইরের আর মনের, ও দুটোর রূপ সম্পূর্ণ আলাদা। বাইরে মানুষকে দেখলে যা' মনে হয় আদতে সে তা' নয়! অথচ তা প্রকাশ করবারও উপায় নেই; বাইরের খোলসটাকে ছাড়লে মানুষের

যা'রূপ হয় সেটা নেহাৎ পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তার এ সহজ প্রকাশের পথ রোধে দাঁড়িয়ে আছে পৌরুষের দাম্ভিকতা আর 'পাছে লোকে কিছু বলে'—এ দুইই! মানুষের জীবন তার নিজের সহজ প্রকাশ নয়—আগোগোড়া একটা মিথ্যা অভিনয় মাত্র!

আদতে মানুষ পাগল আর খেয়ালী ছাড়া আর কিছু নয়—আর তার জীবনের সত্যিকার রূপ হলো একটা বিরাট মিথ্যা অভিনয়! অথচ এ স্পষ্ট সত্যটা মানুষ বুঝে না সে এতো বড় বোকা—অভিনয়ের বাহবায় একেবারে মশগুল!

আমিও তারপর পূজার আনন্দের মাঝে আর আমার নূতন চিন্তাধারায় সব কিছুই হারিয়ে ফেললাম। কেবল মাঝে মাঝে মনের অবচেতন তলদেশে একটা খোঁচা অনুভব করছিলাম—তবে সেটা কিসের?

পরের দিন, গ্রামের আরো আরো ভদ্রলোক এসেছেন—আলাপ হলো তা'দের সাথে। ওদের মন আর চিন্তার সঙ্গে আমার মিল কোথায়? সব কিছুতেই একটা কিছু বলতে হলো—যা একেবারে মামুলি—না বললেও কোন ক্ষতি ছিল না!

হারাণ বাবু নিশ্চয়ই রুক্মিণীর কাছে আমার পরিচয়টা জেনে নিয়েছেন, আমাকে বললেন,—তুমি বুঝি লিখো!

আমি বললাম,—হাঁ—

তিনি বললেন,—তা বেশ—বাবা—তা' বেশ ! ওতে তোমার ভালই আয় হয় শুনলাম !—

উঃ—ওরা কি ? আয় আর টাকা ছাড়া যেন কিছুই ওদের চিন্তার পরিধিতে আসে না—আর কিছু ওরা ভাবতেই পারেনা যেন, শুধু টাকা দিয়ে মানুষের বিচার !—অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছি—বিরক্তি ধরে গেছে ওই একই ধরণের প্রশ্নে, তবু উত্তর দিতে হয়—

বললাম,—তা' মন্দ হয় না—কোন রকমে চলে যায়।

—তা' বেশ—তা তো যাবেই ! আজ বিকালে আমার ওখানে তোমার নিমন্ত্রণ রইলো—শুনলাম তোমার নাকি আবার তাড়াতাড়ি—ওরে খোকা—ওকে নিয়ে যাস্ তো বাবা—। তিনি চলে গেলেন।

রুক্মিণী বললো,—হারান কাকা তোকে ভারি সৎপাত্র ঠাউরেছেন—বুঝলি ?

আমি বললাম,—ওঁর মেয়ে আছে নাকি ? তা' আমাকে কেন ?

রুক্মিণী বললো মৃদু হেসে,—সকাল বেলা আমার কাছে তোর সব কিছু জেনে নিয়েছেন। আর করুণা, মেয়েটিও বেশ —দেখতে কিছু খারাপ নয় !—

বুঝলাম রুক্মিণী ওই করেছে, বললাম,—আচ্ছা, বিকালেই দেখবো সে রূপসীকে !--

বিকাল বেলা হারান বাবুর ওখানে গেলাম, আদর আপ্যায়নেরও কোন ত্রুটি হলো না। করুণাকে দেখলাম,—তাকে সুন্দরী না বলার আমার তরফ থেকে কোন কারণই নেই, বাস্তবিকই সে সুন্দর! সব মেয়েকেই আমার সুন্দর মনে হয়, মেয়েদের বেলায় ওটা আমার দুর্ব্বলতা,— সমস্তটা মিলিয়ে নয়, কোন একটা বিশেষ ভঙ্গিতে! করুণার চলার ভঙ্গীটি চমৎকার —যেমন তাপসীর কথা কওয়ার ভঙ্গীটি। তাপসী রুক্মিনীর অনূঢ়া বোন।

করুণাকে দেখলাম, কথা কইতেও শুনলাম কিন্তু আমাদের সঙ্গে তার আলাপ হলো না—অপরিচয়ের অন্ধকারেই সে রইলো ঢাকা।

হারাণ বাবু বললেন,—তোমাকে একটি কথা বলবো বাবা,—কিছু মনে করো না; অভিভাবক বলতে কেউই নেই আর তোমার ও তো বয়স হয়েছে! বিয়ে থা করে সংসারী হও—আমার মেয়েটিকে তো দেখলে এমন লক্ষ্মী মেয়ে—

মেয়েটি লক্ষ্মীই বটে, আর এমন মেয়েও হয়তো আর হয় না! আমি বললাম,—মাফ করবেন, আমি যে এখন বিয়েই করবো না ঠিক করেছি, আর আমার এ অবস্থায় হয়তো তা' উচিতও হবে না—এই সংসারের দায় ঘাড়ে নেওয়া

তিনি যেন আশ্চর্য্য হয়ে বললেন,—বল কি, বিয়ে করবে না—সংসারে বিয়ে না করে কি কেউ পারে? আর এইতো তার বয়স! কর্ত্তব্যের দিক থেকেও—

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম,—আচ্ছা আমি ভেবে তা' আপনাকে জানাবো কয়েক দিনের মধ্যেই—

· তা বেশ,—তাই বলো - তা' ভাববে বই কি, --

তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। তিনি অবশ্য এ জানানোর অর্থটা ঠিকই ধরে নিলেন,—তবে তিনি যা' মনে করলেন, তা' ভুলও হতে পারে না কি ?

কথাটা চাপা দিলাম সত্যি কিন্তু তা চাপা পড়লো না তো !

রাতে বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলাম,—উঃ, ওদের সঙ্গে আমার কতো প্রভেদ ! আমার চিন্তাধারা আর ওদের চিন্তাধারা, আমার জীবন আর ওদের জীবনের মাঝে কতো বড় ব্যবধান। ওরা হয়তো ভাবতেও পারে না আমার সত্যিকার স্বরূপটা ? আমার সঙ্গে যেন ওদের কোন যোগই নেই,—আমাদের ছু'য়ের মধ্যে সংসারের রূপটার প্রভেদ ঠিক সাদা আর কালোর রঙের তফাতের মতই নয় কি ? আমি সংসারে যা দেখি এই হারাণ বাবুর কল্পনা যুগ যুগান্তের সাধনায়ও সেটার নাগাল যে পাবে না একেবারে খাটি সত্যিকথা এ ! না, আমি ওদের কেউ নই — ওদের সঙ্গে কোন যোগই থাকতে পারে না আমার। আমরা যেন ছু'জন ছু'জনের মুখে চেয়ে দেখছি,—অপরিচিত আমরা,— সংসারের ছু'পার হতে, মাঝে অনন্তকালের ব্যবধান—এ ব্যবধান ঘুচবার নয়। কিন্তু করুণা মেয়েটি ? —সে যখন চলে ?— সে লক্ষ্মী হ'তে পারে তবু তার আর আমার মাঝে কোন যোগই থাকতে পারে না ! আমাদের কোন কালেই যোগ ছিল না—

চিরদিনের অপরিচিত আমরা—আর তাই হয়তো থাকবো। তবু মনে একটুকরা অনুভূতি জেগে থাকে ঘুমের মাঝেও·· ······

দৃশ্যপট বদলে যায়; পরের দিন বিকাল বেলা, তাপসী এসে ডাকে,—সমরদা, চলনা লক্ষ্মীটি, বেড়িয়ে আসি নদীর ধারে! —সঙ্গে ছোট ভাই তপন আর বোন রাণী।

তার এ আহ্বান উপেক্ষা করতে পারি না,—বলি,—তা বেশতো—

তা'দের বাড়ীর রাস্তা গিয়ে নদীতে মিশেছে। বাড়ী হ'তে বেশী দূরে নয়,—কাছেই। দীঘির পার থেকে উত্তরে পোয়া মাইলের ব্যবধান। রাস্তার মাথায় বড়ো বড়ো পাথরে বাঁধানো ঘাট। ঘাটের পাথরে ফাট ধরেছে—প্রকাণ্ড বড়ো বড়ো সাদা পাথর! একটু নীচেই জল—বর্ষার ভরা নদী আর নেই। জল অবধি সিড়ি নেমে গেছে। ওদেরি পূর্ব্বপুরুষ কেউ এ ঘাট বাঁধিয়ে থাকবেন—কোন বিলাসী পুরুষ! তারপর কে জানে কতোকাল কেটে গেছে—কতোকাল ধরে তারি স্মৃতি বুকে ধরে,—বুকে করে কতো হাসি আর দীর্ঘশ্বাসের ইতিহাস দাঁড়িয়ে আছে এ পাথরে বাঁধানো ঘাট! কতোকাল—কতোকাল সে বিলাসী পুরুষের শেষ হয়ে গেছে,—কিন্তু আজকার এই বাতাসও কি তার সেদিনের বিন্দুমাত্র গন্ধ বুকে করে নিয়ে আসছে না এ ঘাটের বুকে—আমার বুকের অনুভূতিতে তুলে মৃদু দোলা।

ঘাটের উপর সাদা পাথারের চাতালে বসে আছি আর দেখছি সেদিনের সহস্র আলোকে উজ্জ্বল নদীবক্ষের উৎসব—যে দিন এ ঘাট বাঁধানো হয়েছিল অতীতের এক গৌরবময় দিনে। পাশে আমার বসে আছে রাণী, সেই চাতালের উপর শ্বেত পাথরের! ফুট্‌ফুটে ছোট্ট মেয়েটি—কথা বড়ো একটা সে বলে না, দুটি চোখে ভারি সুন্দর দৃষ্টি—যেন জগৎটার দিকে অবাক হয়ে সে চেয়ে দেখছে, নিজকে কিন্তু তা' ঢেকে রাখে আশ্চর্য্য এক ধরণে—ধরা দেয় না! তপন নীচের ভাসা সিঁড়িটাতে জলের মাঝে পা ডুবিয়ে বসে হাত দিয়ে জল নাড়ছে—ভারি চঞ্চল সে! আর তাপসী উপরের সিঁড়িতে বসে নদীর ধুকে চেয়ে দেখছে,—দু' একখানা নৌকা স্রোতের টানে তর তর বয়ে যাচ্ছে, সে সেখানে কি দেখছে কে জানে? তপন হঠাৎ উঠে গিয়ে ঘাটের পাশে নুড়ি কুড়োতে লেগে গেল, একটা কিছু মজার আইডিয়া তার মাথায় এসেছে নিশ্চয়। কিন্তু কি সে অনেক ভেবেও তার নাগাল পাওয়া গেল না—কি যে তপন ভাবছে?

এক সময় তাপসী ফিরে বললো,—জানো সমরদা, ওই নদীটি গেছে একেবারে সাগরে—কতো দেশ দেশান্তর ঘুরে, কতো গ্রামের পাশ দিয়ে যেখানে নিত্য হাজার হাজার লোক ওরি জলে স্নান করছে—সাঁতার কাটছে—তাদের স্পর্শ নিয়ে—একেবারে সাগরে—যেখানে কেবল জল আর জল—

আমি বললাম,—সত্যি?—তা' তুমি এসব জানলে কি করে? —বাস্তবিক তাপসীর কথা কওয়ার ভঙ্গিই এই—আর সে যখন

কথা বলে তাকে ভারি সুন্দর দেখায় যেমন করুণা যখন চলে।—

তাপসী উত্তর দিলো,—অমনি জেনেছি—নিজে নিজে কি জানা যায় না? আচ্ছা সমরদা,—সাগরে কেবল জল আর জল —যতোদূর দেখা যায়—চোখের সীমা অবধি—না?

আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে রইলাম তার মুখে! এ কথা কওয়ার ধরণ তারি নিজস্ব, একেবারে একার—আর এ যেন আমারি কথা সে বলে যচ্ছে। বললাম,—হুঁা।

সে বললো,—তারি মাঝে তো এই জলও চলেছে,—মিশবে বলে! কিন্তু সে অনন্ত জলের মাঝে কি এ হারিয়ে যাবে না,—একেবারে মিশে? আজকার এখানকার জলকে যদি কেউ গিয়ে সাগরের বুকে খুঁজে সে কিন্তু তার নাগাল পাবে না কোন দিনই —কোথায় হারিয়ে যাবে কে জানে সে অনন্ত জলরাশির তলায়— সে খুঁজতেই থাকবে শুধু,—কেমন মজা হয় তা হলে!—

আমি অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম,—তাপসী বাস্তবিক ভারি সুন্দর! মনে মনে ভাবলাম,—সত্যিই তো, এই অনন্ত জলের মাঝে সবাই—সব কিছুই আপনার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে না কি?

সে বললো,—আমার কিন্তু মাঝে মাঝে ভয়ানক ইচ্ছা করে সাগরে গিয়ে এ জলকে খুঁজে বের করি,—খুঁজবো সারাজীবন ধরে—খুঁজলামইবা! কিন্তু তাও কি সম্ভব? কেমন করে তা’

হতে পারে ভেবে পাইনে? আচ্ছা সমরদা, বলতে পারো কেন এ ধরণের ইচ্ছা জাগে?

আমি শুধু বললাম,—অমনি হবে—জানিনাতো এ কেন হয়? মনে মনে বললাম,—মানুষ খেয়ালী কি না ভারি অদ্ভূত!

সে আবার জলের দিকে তাকিয়ে রইলো নদীর বুকে।

আমি ভাবতে লাগলাম,—ওদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কতো-কালের!—আমার সঙ্গে ওদের যোগ তো আজকের নয়? অনন্তকাল ধরে যেন আমাদের মন একই সুরে বাঁধা রয়েছে আর যেখানে যতো সুরের ঝঙ্কার উঠছে একই সঙ্গে তা'তে আঘাত করছে তার প্রতিধ্বনি! আমি যেন ওদের সঙ্গে পরম আত্মীয়তায় জড়িত একই অনুভূতির আনন্দে। খেয়ালী আমার আত্মার অভিষেক এরো বুকে—একি কম আশ্চর্য্য!

চেয়ে দেখলাম তপনের দিকে,—চঞ্চল ছেলেটি! তাকিয়ে আছে সে তাপসীর দিকে,—হঠাৎ যেন নুড়ি কুড়ানোর প্রয়োজন ওর ফুরিয়ে গেছে কিংবা গেছে সে কথা ভুলে! ছুটে এলো সে ঘাটের চত্বরে—বললো আমার দিকে চেয়ে,—জানো সমরদা,—দিদি কি দেখছে ওদিকে চেয়ে?

আমি বললাম,—নারে, আমি জানবো কি করে? তাকেই জিজ্ঞেস করি—কি বলো?—

সে বললো উৎসাহিত হয়ে,—তা'কে আর জিজ্ঞেস করতে হবে না—বলবো আমি ?— মখে তার এক ঝলক আনন্দ !

বললাম—বল তো —

সে বললো,— ওই ওপারে ওই যে দেখছো ওটা হলো চণ্ডীপুর—আর ওখানকার জমিদাবের সঙ্গে দিদির বিয়ে হচ্ছে কি না—

তাপসীর দিকে চেয়ে দেখলাম,—সে যেন একটু নড়ে বসলো —বুঝলাম সেও শুনছে কান পেতে—

বললাম - সত্যি তাপসী,—বিয়ে তোমার ?— তা' হলে তো ভারি মজা—না তপন ?

তাপসী বললো ঝাঝের সঙ্গে আমার দিকে ফিরে, বিয়ে না হাতী, আর ওদিকে চাইতে আমার বয়ে গেছে— । তার মুখে মনের এক ঝলক আনন্দের সংবাদ পেলুম ! কথা বলার ভঙ্গীতে তাকে খুবই সুন্দর দেখায় না কি ?

তপন বললো,—মজা নয় ?—দিন ঠিক হয়ে গেছে—অঘ্রানের আঠারোই ; কি মজা ! বাবা বলেছেন সে দিন আমাকে নতুন জামা,—কাপড়, জুতো সব কিছু এনে দিবেন আর আমাকে তা' পরতেই হবে ! কেমন মজা হবে—না সমরদা ? —বলেই সে আবার ছুটে চলে গেল—কি আবার তার মনকে টেনেছে কে জানে কোন্ প্রয়োজনের জোর আর জরুর তাগিদে ! চেয়ে

দেখলাম এক অতি নিরীহ কুকুরের প্রতি সে ঢিল ছুড়ছে আর ছুটছে তার পেছনে— !

মনে মনে ভাবলাম,—একেবারে দিনটে অবধি ঠিক না করলেই কি চলতো না ?······

চেয়ে দেখলাম রাণীর মুখে,—ফুটে আছে সেখানে যেন কৌতুকের একটুকরা হাসি—আর চোখ তুটো তাকিয়ে আছে অবাক হয়ে সংসারের দিকে—

··· ··· ··· ···

অঘ্রানের আঠারোই আমার বিয়ে হয়ে গেল করুণার সঙ্গে ! রুক্মিণী আমার কাছে কাছেই রইলো। সে দিন তাপসীরও বিয়ে চণ্ডীপুরের জমিদারের সঙ্গে—তাতে আমি অনুপস্থিতই রইলাম। মনে কোন ক্ষোভ ছিল কি ?

শরৎ যেন জন্ম জন্ম ধরে আমার কামনার রঙে রাঙিয়ে আসে,—দেয় যা' আমি চেয়ে এসেছি যুগযুগান্ত ধরে ! এ কি জন্মান্তরের স্মৃতিই শুধু,—মিথ্যা কল্পনা ?

করুণা বাস্তবিকই বড়ো লক্ষ্মী মেয়ে—এমন মেয়ে আর হয় না ! সে বাস্তবিক সুন্দর—আর যখন সে চলে তা'কে আরো সুন্দর দেখায় !

তার চিন্তাধারা চমৎকার—একেবারে আমার পরিচিত—ঠিক মিলে যায় ! নমুনা তার না পেলেও পাবেন ঠিকই !

শ্রীহট্ট,

১২ই অক্টোবর, ১৯৪১ইং ।

পরিচয়

খবরের কাগজ, টাটকা খবর—বন্যাপ্রপীড়িত নরনারীর অন্নবস্ত্রের সংস্থান—মানুষের সহৃদয়তার কাছে একান্ত করে নিবেদন পৌঁছিয়ে দেওয়া হচ্ছে যেন তারা দুস্থ দেশবাসীদেরে—তাদেরি ভাই বোনদেরে মৃত্যুর অবশ্যাম্ভাবী কবল থেকে রক্ষা করেন। দেশবাসীর নিকট বন্যাটা আর তার পরিণতিটাই সত্য,—যারা মরছে তাদের কাছে সত্য তাদের অদৃষ্ট আর খামখেয়ালী ভগবানের পক্ষপাতিত্ব,—রাজনীতিকদের কাছে সত্য দেশের অর্থ নৈতিক সমস্যা আর সমাজ ব্যবস্থা যা' মানুষের খেয়ালে গড়ে উঠেছে আর মানুষকে বঞ্চিত করছে তার ন্যায্য প্রাপ্যটুকু থেকে, আর আমার কাছে সত্য ততটুকু মাত্র—এর যতটুকু আমার মর্ম্মে আঘাত করে—আমার মর্ম্মের মাঝে দেশবাসীর মনের যে সুরটুকু বাজে সে সুরটুকু!

নারী প্রগতির আওতায় বেড়ে উঠা নন্দিতার সঙ্গে আমার মতভেদ প্রচুর। তবু একজায়গায় আমাদের মিলও আছে—সেটা না হয় নাই বললাম। এ মতভেদ থাকা সত্ত্বেও আমি তাকে ভালবাসি। সকল মানুষকে আমার ভালবাসার অংশ দিলেও তার প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব আছে—যেমন আমার পক্ষপাতিত্ব আছে আমার দেশের প্রতি, তাই বলে আমি যে

অন্যান্য দেশমাত্রকেই ঘৃণা করি তাও নয়? এমন উদ্ভট স্বদেশপ্রেমিকতা আমার মোটেই নেই! দরদ আমার সকল দেশের সকল মানুষের প্রতিই আছে, তবু আমার পক্ষপাতিত্বও আছে বৈ কি! আমাদের প্রচুর মতভেদের মাঝেও আমাদের মিলনটা মোটেই আকস্মিক নয়—তবে কৌতুকাবহ।

তার পিতামহ তার নাম বিপ্রলব্ধাই রেখে থাকবেন তিনি ছিলেন বৈষ্ণব মানুষ। বাপ মা রেখেছিলেন আনন্দিতা,—তারও নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। তার সেটা মনঃপুত না হওয়ায় সে ছেটে সেটাকে ছোট করেছে—মিস্ নন্দিতা—আর ওটাই গেছে টিকে! নামটা বাস্তবিক ছোট হলো কি? কেমন করে আমাদের দুজনের বিরোধ হলো অনুরাগে পরিণত, আর তার পরিণতি গড়াল বিয়ে অবধি,—একটু পরে বলছি। তারো আগে আমাদের দাম্পত্য জীবনের দু' এক টুকরা বলেই ফেলি।

আমাদের দুজনের প্রচুর মতভেদের কথা বলেছি, তার প্রথম নমুনা হিসাবে বলা চলে আমার মত হলো,—আহার, নিদ্রা, ভয় আর যৌন জীবনকে বাদ দিয়েই মানুষ মানুষ, এগুলিতে মানুষ আর পশুর মাঝে কোন তফাৎ নেই, কোন গণ্ডী টানা সম্ভবও নয়,—এগুলি মানুষ আর পশুর সাধারণ বৃত্তি আর এতে অধিকার দু'য়েরই সমান; কাজেই এ নিয়ে মাথা ঘামানো বিড়ম্বনারই সামিল,—এতে হয় মানুষকে পশু অবধি ঠেলে নিতে হবে নয় পশুকে মানুষ অবধি টেনে আনতে

হবে। আরো স্পষ্ট করে, মানুষ আর পশুর মাঝে গণ্ডী হলো মন আর এই মন থেকেই মানুষের আরম্ভ। নন্দিতার কিন্তু তার ঠিক উল্টা,—ও চারটাই মানুষের ভিত্তি আর তার সব কিছুরই। সব কিছুই ওগুলোকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আর এ নিয়েই তো মানুষে মানুষে যত অনাসৃষ্টি কাণ্ড চলে আসছে। এ দু'য়ের কোন মীমাংসা আছে কি,—বিশেষতঃ যেখানে মতবাদ পৌঁছেছে চরমে আর দু'জনেই নিজের মৌলিক মতবাদের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সচেতন? অবশ্য আমাদের ওসবে কোনদিন আটকায়নি--অনেক আগেই আমাদের মাঝে একটা আপোষ রফা হয়ে রয়েছে।

তবু মাঝে মাঝে আটকায়ও! আমাদের পাশের বাসায় এক ভদ্রলোক থাকেন, কাজ করেন কোন এক আফিসে। চালচলনে মনে হয় ভদ্রলোকের অবস্থা ভালই,—মাইনেটাও মোটা হবে! তাদের পরিবারটিও বেশ বড়ো। ওদের বাসার কথা বলছি,—পরচর্চ্চাটা বাঙালীর পক্ষে নূতন কিছু নয়, আর এমনও শোনা যায় কারো কারো নাকি পরচর্চ্চা না করলে আহারে অরুচি ধরে আর পরিপাক যন্ত্রের কাজটাও যেমনটি চলা উচিত ছিল ঠিক তেমনটি চলে না। আমিও না হয় একটুখানি করলাম—কিই বা তাতে ক্ষতি? ভাগ্যে আমার ভালটাই ফলে যেতে কতক্ষণ? ওদের বাসার কথা বলছিলাম, —বাবুটিকে কোনদিন কিছু বলতে শুনিনি আর ওরা আমাদের সঙ্গে মেশেনও না,—হয়তো সম্মানে বাধে, নাহয় অহঙ্কারে?

তবে ওদের বাসার মেয়েদের ঝগড়াটা আমি প্রায়ই উপভোগ করে থাকি—সারাদিন তা' লেগেই আছে। আমার ঘরটা আবার ওদের বাসাব দিকেই বাড়ানো, আর জানালা দিয়ে বাসার ভিতরটা অবধি দেখা যায়। ফলে আমার জানালাটা বেশীর ভাগ সময়ই বন্ধ থাকে—সেটা যে আমার অনিচ্ছাতেই তা' বলা বাহুল্য! এমন সব বিষয় নিয়ে ওরা ঝগড়া করেন যে হাসিই পায়! ছেলেদের আহার নিয়ে দু'জনের ঝগড়ায় এমন কিছু নূতনত্ব নেই আর সেটা একটা সুষ্ঠু মতবাদ দিয়ে চালিয়ে দিতেও বাধে না, কিন্তু যখন তা'দের ঝগড়াটা উপভোগ্য হয়ে উঠে এমন একটা বিষয় নিয়ে যার মধ্যে কোন কারণই থাকতে পারেনা যেমন,—কে দেখতে কেমন, ও বাড়ীর রান্না, ওর শাড়ি আর এর গয়না—কতটুকু সোনা আছে কিম্বা সমস্তটাই মেকি,—তখন হাসিই পেয়ে থাকে না কি? আমার মতে মেয়েরা ঝগড়াটে আর সেটাই তাদের আসল রূপ—দু'জন মেয়েকে একঘরে বারো ঘণ্টা বন্ধ করে রাখো তারপর ঘরে গিয়ে দেখবে দু'জন দু'দিকে চেয়ে মুখভার করে বসে আছে—কথা কওয়া এমন কি মুখ দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে তাদের মাঝে। নন্দিতা অবশ্য প্রগতি বা সমাজ ব্যবস্থার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হতো। ও বাসার মেয়েদের কথা বলতে গিয়ে সেদিন যেমনি আমার এ সাধারণ মতটা তার কাছে বেফাঁস করেছি অমনি সে সাহিত্যিকের বুদ্ধি আর চিন্তাধারার উপর এমন অনাস্থা জানালো যে আমি চটেই

উঠলাম। তার কি এ বিষয় একটুও ভেবে দেখা উচিত ছিল না? আমি ঘটা করে সেও যে সেই দলের সে কথাটাও তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। তার হয়তো অভিমান হলো, আর অভিমানটা ভালবাসারই আরেক পিঠ মানি,—সে আমাকে ভালবাসে কিনা। তবু তাকে জানিয়ে দিলাম,—অভিমানটা আর কিছু নয়—ঝগড়াটে প্রবৃত্তিরই সভ্য রূপ মাত্র—প্রগতির ছাঁচে ঢালাই করা। এরপর হয়তো সমাপ্তি ঘটলো সাধ্য-সাধনায়—আর তা' ঘটলো লোকচক্ষুর অন্তরালেই,—যা' লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটলো তা' ঢাকাই থাক,—তার বর্ণণাটা বাদই দিলাম!

আমাদের মতের অমিল প্রায় সব কিছুতেই। আরো দু' একটা নমুনা দিয়েই শেষ করি।—কাগজে একটি লাঞ্ছিতা নারীর আত্মহত্যার কাহিনী করুণ করেই বলা হয়েছে। নন্দিতা সেখানে আত্মহত্যার আর লাঞ্ছনার এ দুয়েরই কারণ হিসাবে সমাজ ব্যবস্থার দোষের দোহাই পড়বে। অন্য কেউ হয়তো ফ্রয়েডকে টেনে এনে এর একটা সুব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করবে, আমি কিন্তু দেখবো তার মন আর তার মাঝে যে লাঞ্ছিত মানবাত্মা তাকে—আর তাকেই দায়িও করবো। এ মতভেদের মাঝেও কি একটা মিল—একটা সত্যিকারের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়না? আমরা কিন্তু কোনও এক জায়গায় সত্যি মিল খুঁজে পাই—হয়তো সেটা আমাদের অন্তরের কোন একটা গোপন কোণে? আর এ ও তো অস্বীকার করা চলে না যে

মানুষের সমস্ত জীবনের সুরের উৎপত্তি একটা বিশেষ স্থান হতেই আর সে তারের সঙ্গে সব কিছুই বাঁধা রয়েছে, একটা ধরে টানলে সব ক'টাই নড়বে এমনি !

রুষ জার্ম্মাণ যুদ্ধের কারণ হিসাবে পুঁজিবাদী আর মার্কসকে টেনে না এনে আমি দেখি যান্ত্রিক সভ্যতার মুখোসে মানুষের আদিম হিংসাবৃত্তির বিকৃত রূপ—নূতনের মাঝে প্রগতির তালে এগিয়ে এসে এ পরিণতি তার হয়েছে মাত্র ! আর নন্দিতা পুঁজিবাদী আর মার্কসকে টেনে আনবেই ! কিন্তু তা' না আনলেই কি চলেনা ?

এই তো গেল আমাদের মতবাদের একটা নমুনা, তু'জনের মতের মিল কোন দিনই হয়নি ! আমি সাহিত্যিক—আর নন্দিতা প্রগতির আওতায় বেড়েউঠা স্পষ্ট বাস্তববাদী। তবু আমাদের মনের মিলটা অব্যাহতই আছে, আর তু'জন তু'জনকে ভালোও বাসি ! আমাদের জীবনযাত্রা এতে একটুও আটকায়নি,—আর আমাদের চলার পথে বাধার ও সৃষ্টি করে নি কোন দিনই। আমরা আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি,—এ কেমন করে সম্ভব হয়—যেখানে তুজনের দৃষ্টিভঙ্গিই সম্পূর্ণ আলাদা ? তবু তা যে সম্ভব হয় এ তো আর মিথ্যে নয় ? বোধহয় এখানে সবচেয়ে বড়ো কথা আমরা তু'জনই মানুষ—আর সেখানে আমাদের এ মতভেদের আপোষেরও একটা কৈফিয়ৎ তৈরি হয়েই আছে—যার জন্য ঘুরে মরতে হয় না—মানুষের মাঝে যার স্বতঃ প্রকাশ !

তাই হয়তো এ মতভেদের মাঝেও আমাদের মিলন হয় আর সেটা আকস্মিক ও নয় তবে ভারি মজার! সেই আসল কথাটাই এবার বলি!

অনুরাগে যেমন আকর্ষণ আছে বিরাগেও তার চেয়ে আকর্ষণ কম নেই! বিরোধের মাঝে মিলনের সেতু রচিত হয় আর আমরা আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি,—এ কেমন করে হলো? তবু তা হয় আর দুটি বিরুদ্ধ হৃদয়ের মাঝে জেগে উঠে জয়ের আগ্রহ—দু'জনই দু'জনের পানে ছুটে চলে বিরোধের আকর্ষণে, আর এক সময় চেয়ে দেখে কবে কোন শুভ মুহূর্ত্তে তার মীমাংসা হয়ে গেছে অনেক আগে—তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে,—জয়ের প্রসাদে নয়, পরাজয়ের আনন্দে! এমনি করে তার সমাপ্তির ইতিহাসে হয় মিলন—এটা ইতিহাসে নূতনও নয়, আর দুর্লভ ত নয়ই।

আমাদের প্রথম দেখা এক বাসের থার্ড ক্লাসে আর সেটা অপ্রত্যাশিতের ভিতর দিয়ে। কেন এমন হয় জানিনা, বোধহয় এর জন্য আমার মেজাজটাই দায়ী।

বাইরে বৃষ্টি ঝরে পড়ছে, ভিতরে ভিড়, সকলেরই কাপড় জামা ভিজা—জল ঝরে পড়ছে, আর তাতে বাসের ভিতরটার সঙ্গে বাইরের বৈসাদৃশ্য ক্রমেই আসছে কমে। আমি এক কোণে বসে এ সব চেয়ে দেখছি। এরি মাঝে নন্দিতারও আবির্ভাব হলো—আর কেউ হলে নিশ্চয়ই ইতস্ততঃ করতো,—ভিজা কাপড়, মুখে দৃঢ় ভাব—আত্ম বিশ্বাসের ছাপ! কিন্তু বাসের ভিতর স্থান কোথায়? সবাই দাঁড়িয়ে আছে আর ভিজা কাপড়

থেকে জল ঝরে পড়ছে। নন্দিতার দিকে চেয়ে মনে হলো—সে একেবারে সাধারণ জাতের মেয়েত নয়ই যাদেরে আমি রোজ দেখছি যাদের আহ্লাদী স্বভাবের সঙ্গে আমি খুবই পরিচিত; বরং তার মুখে স্পষ্ট বিদ্রোহের আভাস দেখা যাচ্ছে—চোখে তীব্র হিংসার দীপ্তি! আমাদের দিকে চেয়ে দেখার যে কোন প্রয়োজনই থাকতে পারে তা যেন সে স্বীকারই করতে চায় না—আমাদের অস্তিত্বটাকে অবহেলা করছে, মোটেই আমলে আনছেনা এমনি ভাবখানা! তার দিকে চেয়ে দেখতেই যে শুধু দৃষ্টিতে বাধে, পৌরুষে আঘাত লাগে—তাই নয়,—কথা বলতেও ইচ্ছা করে, আর কেবল কথা বললেই যে তার পূর্ণ পরিতৃপ্তি হবে তাও নয়,—ইচ্ছাকরে খুব করে এক চোট ঝগড়া করে নিই। তারও দৃষ্টিতে শুধু অবজ্ঞাই নয়—যুদ্ধং দেহি ভাবখানা একেবারে স্পষ্ট। যাহোক উপায় যখন নেই চুপ করে তার মুখের দিকে তাকিয়েই দেখতে লাগলাম। একটু সুযোগ কি আর সত্যিই মিলবে না? সেও চারদিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি ফেলে শেষটায় কি জানি কি ভেবে আমারি কাছ ঘেসে দাঁড়ালো! লোকগুলোর মুখে চেয়ে দেখলাম,—তাতে যেন ভয় আর আত্মগোপনের ভাবটাই প্রকট হয়ে উঠছে। মনে বেশ আমোদ অনুভব করলাম; আর সেই সঙ্গে পীড়া দিতে লাগলো তাদের অভদ্র চাপা দৃষ্টির আঘাত।

নন্দিতার দিকে চেয়ে দেখলাম। শরীরের রেখায় রেখায় যৌবনের সুস্পষ্ট প্রকাশ—সুন্দরী সে, গায়ের রঙে নয়,—শরীরের

গঠন ভঙ্গিতে আর তার গৌরবময় অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশে! চোখে কি আমার প্রতিবাদই ঝলসে উঠেছিলো, আর মনটা সত্যি উঠেছিলো বিরূপ আর বিতুষ্ট হয়ে?

সুযোগ বাস্তবিক মিলে গেল, আর সেটা যত তুচ্ছই হোক আমি সে সুযোগের সুবিধা নিতে মোটেই বিলম্ব বা ইতস্ততঃ করলাম না। তার আঁচল থেকে জল ঝরে পড়ছিলো আমার উপর। আমি বললাম,—দেখুন, নিরিবিলি কোনটায় গরীব বসে, তাকে ভিজিয়ে দিয়ে আপনার কিইবা লাভ বলুন?—[illegible]রে আমার ঝগড়া ফুটে উঠলো নাকি? অথচ আমি কতো সহজে মিষ্টি করে বলতে পারতুম দাঁড়িয়ে উঠে,—ওখানটায় বসুন,—বসলে যেন আমি কৃতার্থ হয়ে যাবো এমনি ভাবে!

সে বললো আমার দিকে চেয়ে, আমাকে মাফ করবেন, ওটা আমি লক্ষ্য করিনি,—তারপর আঁচল সামলে বাইরের দিকে চেয়ে রইলো। চোখে কি তার স্পষ্ট অবজ্ঞারি আভাস ছিল না?

রাগে আমি জ্বলে উঠলাম,—বললাম,—না, ওটা লক্ষ্য করবেন কেন বলুন, এতো আপনাদের দাবি, নারী জাগরণের এইতো ধরণ! মনে রাখবেন, অপরকে অবহেলা করে নিজের সম্মান আদায় করা যায় না—অত্যাচার করে-তো নয়ই,—আজ ভাবি কেমন করে আমি এসব সেদিন বলেছিলাম এমনি করে। বলে ফেলে কেমন একটা লজ্জা অনুভব করতে লাগলাম—

ভাবলাম,—মাফ চেয়েনি! তার উপর লোকগুলো আমার দিকে চেয়ে দেখছে, কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম অথচ এতোগুলো দৃষ্টির সামনে মাফ চাইবার সাহসও খুঁজে পেলাম না।

সে বললো,—আমার কথা আপনার বিশ্বাস হলোনা, সত্যি আমি লক্ষ্য করিনি ওটা,—

চোখ দুটো তার জ্বলছে, মুখ কেমন একটা উত্তেজনায় লাল হয়ে এসেছে, ঘাড়টা রয়েছে বেঁকে,—বাস্তবিক তাকে ভারি সুন্দর লাগলো, লজ্জিত চোখে তার সেই বাঁকানো ঘাড়ের দিকে চেয়ে রইলাম—কি সুন্দর! সে বলে চললো,—

—আপনি হঠাৎ চটে উঠলেন কেন জানিনা—তবে আপনারা আমাদের অবহেলা না পাওয়ার মতো কি কাজই বা করেছেন বলুনতো যে আমরা আপনাদিগকে ফুল চন্দন দিয়ে পূজো করবো! আপনাদের অত্যাচার যে কখন কোন দিক দিয়ে আসে তাও ভেবে পাইনে, আর তা ছাড়া সাধারণ ভদ্রতা বলে যে একটা জিনিষ আছে সেটাও আপনারা অকারণ উত্তেজনার মুখে ভুলে যান,—বলে সে বাইরে তাকিয়ে রইলো যেন সে কিছুই বলে নি! তাকে কতো সুন্দর লাগছে! আমি বাস্তবিক লজ্জায় আর তার দিকে চাইতে পারলুম না—বাইরে চেয়ে রইলাম!

এতো গেলো আমার পরাজয়, তারপর তাকে আমি জয়ও করেছি, সে ইতিহাসটাও বলি।—

বাইরে থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলাম সে চলে গেছে,—বাস্তবিক আমার এ অকারণ রূঢ় ব্যবহার আমাকে পীড়া দিচ্ছিলো, কিন্তু তার কাছে মাফ চাওয়ারও কোন পথ আর তখন খোলা নেই। না জানি তার নাম—না তার ঠিকানা—কিছুই। সত্যি আমি অনুতপ্ত কিন্তু এখন আর উপায়ও নেই মোটেই—মুখের কথা আর হাতের ঢিল ছুঁড়লে আর ফিরে আসে কি ?

কিন্তু কিই বা এমন করেছি যে তার কাছে আমাকে মাফ চাইতেই হবে—না চাইলেই চলে না ? সেও কি এমনি ব্যবহার পাবার উপযুক্ত নয় ? তবু মনটা অবুজ হয়েই রইলো !

তা'কে আমার ভালো লেগেছে। তার মাঝে দেখেছি এমন একটা অকুণ্ঠিত প্রকাশ যা আমি আর কোন মেয়ের মাঝে দেখতে পাইনি—যেমনটি সচরাচর চোখে পড়ে না। হয়তো এ তারি আকর্ষণ—আমার এই ভালো লাগা।

কিন্তু উপায় ও একটা হয়ে যায়। মনের মাঝে অস্বস্তি নিয়ে কয়দিন কাটলো—কেমন একটা নাম-না-জানা অনুভূতি। তারপর আবার সহজ হয়ে এলুম। মাঝে মাঝে তার বাঁকানো ঘাড় মনের মাঝে উঁকি মারতে লাগলো মাত্র তবে তাতে আশ্চর্য্য হবার মতো কিই বা আছে !

মাসেক পরে সে এক ছুটির দিন। দুপুরের পর—বেলা তিনটে হবে। বর্ষাকাল, মেঘের পরে রোদ উঠেছে—রোদের তাতে গায়ে জ্বালা ধরে। আমি বাসায় ফিরে আসছি—পথে

তার সঙ্গে দেখা। সে আপন মনে চলেছে—রোদে তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে—মুখের পাশে ঘামের মাঝে লেপ্টে আছে কালো চুল,—স্পষ্ট চোখে পড়ে। রাস্তা দিয়ে যে আমিও চলেছি সেদিকে তার খেয়ালই নেই—যেন আমি মানুষই নই। মনটা আবার বেঁকে বসলো—তবু তাতে জোর বর্ত্তব্য বুদ্ধির লাগলো ধাক্কা ; আমি জানি,—এ কর্ত্তব্য বুদ্ধি ছাড়া আর কিছুই নয়! পাশে গিয়ে তাকে বললাম,—দেখুন,—সেদিন বাস্তবিক আমারি অন্যায় হয়েছে, আমি লজ্জায় আপনাকে মুখ দেখাতে পারছিনে,—তবু পাপের প্রায়শ্চিত্তটাও তো করা চাই—নইলে মনের কাছে জবাবদিহি করতে হয় যে! আমাকে মাফ করবেন, বাস্তবিক আমার সে দিনের ব্যবহারে আমি লজ্জিত!

সে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো, তারপর মুখ নামিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে কি ভেবে নিলো কে জানে,—বললো,—এই তো কাছেই আমাদের বাসা, চলুন না সেখানে আমার সঙ্গে, এখানে ঠায় রোদে দাঁড়িয়ে থাকবেন আর কতক্ষণ বলুন ?—

একি অপরিচিতকে আহ্বান,—আমি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলাম। তবে কি আমি ওর পরিচিত ?

এবার থেকে আমার জয়ের পালা সুরু হলো।

সে এগিয়ে চললো, আমিও চললাম তার পিছনে। সত্যি তাদের বাসা বেশি দূরে নয়! ছোট্ট বাসাখানি, মোটে তিনটে ঘর,— রান্না ঘর একখানা। খুব যে পরিচ্ছন্ন তাও নয়, দেখে

মনে হয়,—ওরা নিজের হাতে সবই করে আর অবস্থাও যে খুব স্বচ্ছল তা নয়। বসবার ঘরের বালাই নেই, দেখে মনে হলো —সব ক'খানাই এক সঙ্গে বসা, শোওয়া, পড়া প্রভৃতি সব রকমের কাজেই লাগে! ঢুকেই একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম—নন্দিতা এগিয়ে গেল। সামনে টেবিলে পড়ার বই— নেহাৎ গন্ত পাঠ্য বই ছাড়া আর কিছুই নেই,—একখানা হাতে নিয়ে দেখলাম,—মিস্ নন্দিতা দেবী,—বুঝলাম এখানে আমার অনধিকার প্রবেশ, একখানা শেলি, কীটচ, বাইরণ তো নেইই কোন দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে পর্য্যন্ত উঁকি মারতে দেখলাম না। পাশে শ্লেটের উপর তিনখানা ছেঁড়া বই উপরে লেখা— শিশির ছোট ভাই আর নামটা লিখে দিয়েছেন তার বোনটি স্বয়ং। উপরে তাকের উপর বড়ো বড়ো বই, কালো চামড়ায় বাঁধানো, সোণালী আখরে নাম লিখা। প্রথম যেখানায় চোখ পড়লো সেখানা 'এলমেণ্টচ্ অব মিকানিজম্'—নীচে উচ্চারণ করা যায় না এমনি তিনখানা নাম পরপর সাজানো—পদবী সমেত। বুঝলাম,—ওর বাবা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার! টেবিলের উপর দেখলাম অন্ততঃ তিনখানা নারী সমিতির বা এমনিতরো একটা কোন মেয়ে প্রতিষ্ঠানের বড়োবড়ো বাঁধানো খাতা— মিস্ নন্দিতা যে এগুলোর সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত সে বিষয় আর কোন সন্দেহই রইলোনা। তার সম্বন্ধে আমার কৌতূহলটা আরো বেড়ে গেল—নেহাৎ কৌতূহল ছাড়া নিশ্চয়ই আর কিছু ছিলনা, তবু এ অবুঝ কৌতূহল কেন?

প্রায় আধা ঘণ্টা পরে নন্দিতা আবার ফিরে এলো। এবার দেখলাম তার বেশভূষায় পরিবর্ত্তন হয়েছে।

আমি বললাম,—মিস্ নন্দিতা দেবী, প্রগতির যুগে কি অমনি ডেকে এনে অপমান করাটাই নিয়ম!—সে একটু চমকে টেবিলের দিকে চেয়েই হেসে ফেললো। তারপরে বললো,—

—সোমনাথ বাবু, প্রগতির উপর আপনি খুব চটা—না? কোথায় রোদে ছিলেন, ঘরে এনে দিলুম আশ্রয়—ভাবলুম দেখি নারী প্রগতিকে আপনার সুনজরে ফেলতে পারি কি না,—কোথায় কি—ভাগ্যের মার কে খণ্ডাবে বলুন? এযে কপালে লেখা—ধুয়ে ফেললেই কি মুছে যায় এ দাগ? নাঃ—শেষটায় ভাগ্যটাকে একান্ত আমাকে মানতেই হবে দেখছি।—চাপা হাসির আড়ালে তার গম্ভীর মুখের দিকে আমি চেয়ে রইলাম। কি আছে এ মুখে—কে এ ঐশ্বর্য্যময়ী নারী! আর ওর মনটা আমার কাছে অচেনা বলেই মনে হচ্ছে না কি?

বিস্মিত হয়ে ভাবলাম,—ও আমার নাম জানলে কি করে—সেই তো সবে একবার মাত্র আমাদের দেখা! আমার যদি বা তার নামটা জেনে ফেলবার কারণ আর উপায় দুইই বিদ্যমান তার দিক থেকে ত এ দু'য়েরই অভাব!

জিজ্ঞাসা করলাম,—আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?

উত্তর দিলো সে,—কেন,—আপনি আমার নাম জানতে পারেন আর আমি সেটা পারিনা কি? আচ্ছা, ঝগড়াত আমা-

দের হবেই, চার জল এতক্ষণ নিশ্চয় ফুটে গেছে.—নিয়ে আসি, দেখি ভাগ্যের সঙ্গেই আপাততঃ ঝগড়া করে!

ফিরে এলে চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম,—কই, বললেন না তো কোথায় পেলেন আমার নামটা!

কেন.—সেই প্রথম দিনই তো জেনেছিলাম আপনি সোমনাথ বাবু,—শুনে নিশ্চয়ই সুখী হবেন—স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক।—চায়ে চুমুক দিয়ে হেসে সে বললে!

শুনে সুখী হলাম কিনা জানি না, তবে চটে যে উঠলাম তা ঠিক; তার হাসিটা কি শ্লেষের হাসিই নয়? চায়ের উচিত ছিল তেতো হয়ে যাওয়া কিন্তু দিব্যি মিষ্টিই যে লাগছে!

মেজাজটা আমার ওই ধরণই, আর কতোবার যে এরজন্য ঠেকতে হয়েছে! চটে গিয়ে বললাম,—

—মেয়েদের ধরণই ওই, কথা আর তাদের ফুরোয় না শ্রোতাকে অতীষ্ঠ না করে—যেন একেবারে কথার জাহাজ, একটু ছুতা পেলে আপনারা যে কোথায় না টেনে নিয়ে যেতে পারেন ভেবে পাইনে! দুঃখ এই,—প্রগতিও আপনাদেরে একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলো না—একেবারে আদিম কালের মেয়ে আপনাদের মন জুড়ে বসে আছে।—সে যদি এরকম করে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকে হাসে তো রাগের দোষটা কি,—কেই বা এতো সহ্য করতে পারে? সহ্যের ওতো একটা সীমা আছে!

—তবু ভাগ্য ভাল, শেষ পর্য্যন্ত প্রগতিরই হলো পরাজয়—আর মেনে নিলেন, আমরা যে মেয়ে সে কথাটাও! মেয়ে হওয়াটা কম গৌরবের কথা নয়—আপনার কথায় যাহোক একটু ভরসা পেলুম!—সে হাসছে আর জমে উঠছে আমার মনে রাগের ঝাঝ! কিন্তু একটু পরে……

একটু হেসে সে আমার হাতের দিকে চেয়ে বললো,—সেদিন আপনার হাতে যে আংটিটা ছিল সেটা কি হারিয়ে ফেলেছেন?—

কোন উত্তর দিলাম না, চোখে মুখে অলক্ষ্যে হয়তো এক ঝলক রক্তও খেলে গেলো। মনে বুঝলাম,—আংটিটাই যত অনর্থের মূল! আমার নামটা তাই হয়তো ও জানতে পেরেছে,—তবু আংটিটার বিষয় কি ওখানে চেপে যাওয়াই সুবিধের নয়? সেও এ বিষয়ে আর কিছু বললো না—কি আমার মুখে দেখলো কে জানে? চোখ মুখ কি আমার সত্যি লাল হয়ে উঠেছিলো? তার চোখ দুটো কিন্তু আমার মুখেই রইলো—মনে মনে নিজের উপরই চটে উঠলুম,—আর তারও এ অন্যায়—এই এমন করে তাকিয়ে দেখা? কি আছে আমার মুখে যে সে এমন হা করে তাকিয়ে দেখছে—আর কি কোন দিকে চোখ ফেরানো পাপ নাকি—আর কি কোন দিকে চেয়ে দেখা যায় না—বাইরে ও তো কতো কিছু……

বললাম—তারপর আমিইযে সাহিত্যিক সোমনাথ সেটাই বা আপনি জানলেন কি করে?

সে বললো,—তা' তখনই অনেকটা বুঝেছিলুম, তারপর সে দিন বিকেল বেলা কলেজ থেকে ফিরবার পথে দেখলাম আপনাকে রাস্তাদিয়ে চলেছেন,—পরনে লাল ফিতাপেড়ে ফরাস ডাঙার ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবীর উপর সিল্কের চাদর জড়ানো, পায়ে সাদা হাতে কাজকরা পাম্পসু,—রাস্তার বাঁপাশে চেয়ে,—কতকগুলো ইরাণী পুরুষ আর মেয়ে ছিল, তাদের মাঝে ছিল একজনের বেগুনী রঙের ঘাঘরি,—বুকের উপর আঁট করে জড়ানো গোলাপী জামা,—একটি মেয়ে,—মনে হলো তারি দিকে চেয়ে দেখছেন যেন—

আমি অবাক হয়ে তার মুখে চেয়ে রইলাম,—সে হাসছে। বাস্তবিক সেদিন এক সাহিত্যের আসরে চলেছিলাম আর রাস্তায় ওদের বাস ও আমার পাশ দিয়েই গেছে সত্যি, কিন্তু সেখানে নন্দিতা আছে জানলে কক্ষনো আমি রাস্তার বাঁপাশে চেয়ে দেখতাম না! কিন্তু ওই একটুতো মাত্র সময় এরি মাঝে সে এতোসব লক্ষ্য করে দেখলে কি করে? আমার গর্ব্ব ছিলো আমার চোখের মত এতো দ্রুত লক্ষ্য করে দেখতে পারে এমন চোখ বিরল! কিন্তু দেখলাম এ আমার ভুল,—লক্ষ্যকরে দেখবার ব্যাপারে মেয়েদের চোখের জুড়ি হয়না—একবার দেখেছে কি একেবারে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত নির্ভুল বর্ণনা দিয়ে যাবে,—যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। আর পোষাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে সেটা আরো যেন প্রখর হয়েই উঠে······ এখানে আমি হেরেই গেছি—এই লক্ষ্যকরে দেখবার ব্যাপারে

মেয়েদের কাছে। কিন্তু নন্দিতার কাছে সত্যিই কি এ আমার হার হলো? সত্যি এখানে বিজয়ী কে,—আমি—না সে?

যাহোক সে বলেই চললো,—বাস্তবিক সে চেয়ে দেখবার মতো মেয়েই বটে,—তার সৌন্দর্য্য যেন তার পোষাকের বাঁধ না মেনে বেরিয়ে পড়ছিল,—সে যেন রূপের এক বিরাট প্রকাশ যা কোন দিন হয়নি—হবেনা! এমন সৌন্দর্য্য আমি কোনদিন দেখিনি! আজো আমি ভেবে পাইনে,—এমন আবেষ্টনীর মাঝে এমন সৌন্দর্য্য কেমন করে হয়? গোবরে কি সত্যি পদ্মফুল ফোটে?—আমি চেয়েই ছিলাম, হঠাৎ রেবা আপনাকে দেখিয়ে বললো,—এঁকে চেনো নন্দিতাদি,—আমি বললাম,—কাকে? —সে বললো,—বাঃ; এঁকে চেনোনা, ইনিই যে সাহিত্যিক সোমনাথ বাবু! আমি বললাম,—তাই হবে! রেবার সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে—না সোমনাথ বাবু?—

আমি শুধু বললাম,—হাঁ—

নন্দিতার সঙ্গে আলাপ আমার সহজ হয়ে এলো!

মনে মনে ভাবতে থাকলাম,—রেবার সঙ্গে কতোদিন কতো কিছু আলাপ করেছি, কিন্তু সে ও তো কই তাদের সেরা নন্দিতাদির নামটি ভুলেও আমায় বলেনি! কিন্তু কেন?

সেদিন চলে এলুম। তারপর তাদের পরিবারের সকলের সঙ্গেই আমার পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্টতায় পৌছালো। রোজই গেছি বিকালের দিকে,—ছুতাধরে সকালেও! এমনি দিনের

পর দিন, মাসের পর মাস—ছ'মাস হবে! কি যেন আমাকে টেনে নিয়ে যেতো—সে কি মোহ? কৌতূহল তো কবেই কেটে গেছে—তবে এ কি?—ভালোবাসা নয় তো?

এবার একটু তাড়াতাড়িই শেষে পৌঁছানো প্রয়োজন। আর্টের দিক থেকে জোর তাগিদ আসছে যেন! কিন্তু আর্টই কি আর্টের একমাত্র প্রতীক্ নয়?

নন্দিতার সঙ্গে প্রথম কিছুদিন শুধু ঝগড়াই চললো। সব কিছুতেই সে লাগলো 'মেটিরিয়েলিজমের' বুলি আওড়াতে,—আর আমি সেটাকে একেবারেই আমল না দিয়ে দিয়ে গেলাম আর্ট আর বিশ্বপ্রেমের—মানুষের হৃদয়ের আর মনোবৃত্তির দোহাই। মানুষের হৃদয়কে টেনে টুকরো টুকরো করলেও যে সেটা মিথ্যেই হয়ে যায় তাই আমি প্রাণপণে প্রমাণ করতে লেগে গেলাম! আর সত্যিইত সে জায়গাটার সত্যিকারের পরিচয় কি আজো কেউ পেয়েছে?

একটা জিনিষ শুধু লক্ষ্য করলাম,—যিনি নন্দিতার গুরু তিনি প্রতিভাবান নিঃসন্দেহ। কিন্তু মানুষকে তিনি শুধু এক দিক দিয়েই দেখেছেন, সেখানে টেনে এনে মীমাংসা করেছেনও সুন্দর ভাবেই—কিন্তু সবদিক দিয়ে তিনি মানুষকে বিচার করেন নি। শুধু বাইরের দিক থেকেই তাই তিনি মানুষকে নাগাল পেয়েছেন কিন্তু ভিতরের দিক থেকে তার প্রতি তিনি করেছেন অবিচার,—আবার সেখানে হয়তো সুবিচারের চেষ্টাও

বৃথাই ! আর সেখানেই তিনি হেরে গেলেন—আমি তাঁকে জিতে ফেললাম,—আর তাতে সাহায্য করলো আমার সাহিত্যিক সত্তা, আর পৌরুষ।

লক্ষ্য করলাম আরেকটা জিনিষ,—যে নন্দিতা সব ছেড়ে দিয়েও মেয়ে মানুষই। একেবারে আদিমতা থেকে এগিয়ে এসে মানুষ আজ সভ্যতার শিখরে দাঁড়িয়ে, কিন্তু সত্যি সে সেদিনো যেমন ছিলো আজো আছে ঠিক তেমনি—একটু পরিবর্ত্তন ও তার হয়েছে কি ?

এমনি করে একদিন আমরা দেখলাম, বাইরের গরমিলের চেয়ে আমাদের মনের মিলটাই বেশি—আর আমাদের ঝগড়ারও সমাপ্তি হয়ে এসেছে সেখানেই ; কাজেই আমরা ঝগড়াও করলাম আবার সেটা বুঝলামও ! ভাবের ঘরে যতই লুকোচুরি করি এখানে কিন্তু আমরা ধরা পড়ে গেলাম ঠিক। আমাদের অন্তরের মানুষ প্রকৃতিই হলো জয়ী !

ফলে আমাদের বিয়ে হয়ে গেলো আর ঝগড়াও থামলোনা।

জীবন—

শূন্য দিগন্তের কোনে একটুকু মেঘ তার তামাটে আঁখি মেলে চেয়ে আছে শুক্‌নো মাঠের বুকে। সেদিকে চেয়ে পরাণ একবার দেখলো, তারপর ধীরে ধীরে ফিরে চললো বাড়ীর পথে। মনে তার অসংখ্য চিন্তা—মুখ অনেকটা ভাবলেশ হীন!

পরাণ সাধারণ মানুষ হতে পারে, তবে তাতে আমাদের গল্পের আভিজাত্য একটুও ক্ষুন্ন হবে না, তাও নিশ্চয় করে বলা যায়। আর সে মানুষ হিসেবে বোধহয় কোন মানুষের চেয়ে কম নয়। সকলের যা আছে তারো মাঝে তার কোন অভাব নেই। স্নেহপ্রীতি, সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা, মনের অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাত—ব্যথা—তারো মাঝে কি ঠিক আমাদের আর দশ জনের মতই নেই? আর গল্পের প্রাণ হৃদয়ে—বাইরে হাজার খুঁজাখুঁজি করলেও তার নাগাল পাওয়া যায় না।

বাড়ীর পথে সে ফিরছে। —এবার বৃষ্টি নামলোনা এখনো, —পাপে পৃথিবীটা ভরে গেলো, তাই দেবতা রাগ করেছেন মানুষের উপর—নইলে এখনো জল নামবে না কেন? —ভাবতে ভাবতে সে চলে বাড়ীর পথে। এ তার অভ্যস্থ পথ। ছোট বেলা থেকে সে রোজই এ পথে হাটছে—শতবার যাতায়াতে! সে আজ জানে ওই মেঘে রঙ ধরেছে কেন? সাঁঝের

লাল রঙ লেগেছে মেঘের গায়ে তাই। কিন্তু ছেলেবেলায় সে অবাক হয়ে চেয়ে দেখেছে ওই রঙধরা মেঘের দিকে—ওরি ওপারে ওই আকাশের উপরে দেবতারা আছেন। ততদূর দেখা যায়না কিনা!

হঠাৎ তার মনে পড়ে সৌদামিনীর কথা। কে ওই মেয়েটী? —ছেলেবেলায় সে কাজ করেছে বাবার সঙ্গে এই ক্ষেতে। তখনো সে ছোট। হঠাৎ একদিন তার বিয়ে হয়ে গেলো পাশের গ্রামের সৌদামিনীর সঙ্গে,—ছোট্ট নোলক পরা মেয়ে! কি ছিল তার চোখেমুখে যা' এমনকরে তাকে টানতো ঘরের পানে? সে কাজে অকাজে যখন তখন বাড়ী ফিরে যেতো ছুতা ধরে? সেকি শুধু তাকে দেখবারই জন্য নয়? সৌদামিনীও হয়তো ঘুমটার ফাঁকে তাকে চেয়ে দেখতো—তারপর ফিক করে হেসে ঘুমটা টেনে চলে যেতো,—মেয়েরা সাধারণতঃ ভারি দুষ্টু হয়ে থাকে কিনা? কতদিন সে তার মুখ একটিবার দেখবার জন্য আগ্রহভরা চোখে চেয়ে রয়েছে, তারপর কোনদিন বা ঘুমটার ফাঁকে হয়েছে তাদের চোখাচোখি—কোনদিন বা হয়নি। দুজনই যেন ছিল দুজনের কাছে ঠিক রহস্যের মতো। তারপর ধীরে ধীরে তারা বড়ো হয়ে উঠেছে। সে ভারি মজার কিন্তু ....তারপর একদিন বাবা মারা গেলেন। সে বছরের পর বছর ক্ষেতে চাষ করে চলেছে। এই ক্ষেতই তাকে যুগিয়েছে ক্ষুধায় অন্ন—তৃষ্ণায় জল। এইক্ষেত তার জীবনের সঙ্গে একেবারে জড়িয়ে আছে—তার সঙ্গে—সৌদামিনীর সঙ্গে! এই

ক্ষেত তাদের প্রাণের সঙ্গে বাঁধা। তাদের নিজেদের চিন্তার সঙ্গে এ যেন জড়িয়ে আছে—একে বাদ দিয়ে নিজেদের চিন্তা যেন একেবারেই অসম্ভব। আর সৌদামিনী? —তাদের দুজনের জীবনও যেন ধীরে ধীরে এক হয়ে মিশে গেছে,— কেমন করে তা হলো—সে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে!—

গরীবের সংসার! দুঃখ কষ্ট আছে সত্যি। অভাব অভিযোগের ভিতর দিয়ে কোন মতে দিন চলে যায়—খেটে খায় তারা - সারাদিন কাজ আর কাজ। তবু রাত্রি আসে তার স্বপ্ন নিয়ে—সেটা দুঃস্বপ্ন নয়—আর প্রভাতও আসে দিনের ব্যস্ততায়! প্রভাতও আসে—আবার রাত্রিও আসে স্বপ্ন নিয়ে! এমনি দিনের পর দিন চলে। হয়তো সে স্বপ্ন সার্থক হয়ে ফুটে উঠেনা—তবু তা স্বপ্নই—আর তার আরাম? সৌদামিনীকে ঘিরে পরাণ কামনায় তার কল্পলোক গড়ে তুলে —মন তার ভরে উঠে! কাজের ফাঁকে, অভাব অভিযোগের মাঝখানে এই যে তাদের কল্পলোক—হোক না তা অল্প-পরিসর, তবু তাই বা কম কিসে? পরাণ ভাবে,—সৌদামিনীকে সে হয়তো সুখী করতে পারেনি, ভালো খাওয়া পরা তাদের জুটে না—অভাবের সংসার —আর মেয়েরা একটু ভাল খাওয়া পরা চায়! তবু সৌদামিনীতো কোনদিন তাকে অভিযোগ জানায় নি? নিজের ভাগ্য নিয়েই সে যেন খুশি—হয়তো এই ভালো—চাওয়া হয়তো চলে —কিন্তু পাওয়াটা?··

—এবার বৃষ্টি এখনো নামেনি, এতো দেরী কোন বছর হয় না—হয়তো নামবে না? তাহলে তাদের কি হবে? তাদের

যে এছাড়া আর সম্বল নেই। ক্ষেতে যদি ফসল না ফলে? কি করবে তারা? সৌদামিনীর অনশন-ক্লিষ্ট মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠে—তারপর……সে ভাবতে পারেনা। ভাবতে সে ভয় পায়—না এ কখনো দেবতার ইচ্ছা হতে পারে না! মন তার দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে উঠে। শুক্‌নো মাঠের দিকে চেয়ে তার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। কে জানে কি হবে—কি দেবতার ইচ্ছা? ……

কয়দিন থেকে সে বার বার আকাশের দিকে দেখেছে—ওই মেঘ করলো বুঝিবা! রাতে ঘুম থেকে উঠে এসে আকাশের দিকে চেয়ে দেখেছে—মন তার দুশ্চিন্তায় ভরে উঠেছে। সৌদামিনী চেয়ে দেখেছে তার মুখে নীরবে। তারপর হয়তো বলেছে,—কালই জল নামবে দেখো,—ঠাকুর কি আর আমাদের দয়া না করে পারবেন? তিনি যে গরীবের ঠাকুর!—এর বেশী সে আর কি বল্‌তে পারে? স্বামী ঘুমিয়ে গেলে তার দুশ্চিন্তাগ্রস্থ মুখের পানে চেয়ে সে চোখের জল রুখতে পারেনি—সেও বেশ ভীত হয়েছে,—এ তুমি কি করলে ঠাকুর,—বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে যে—ফসল না হলে আমরা খাব কি—আমাদের বাঁচাও ঠাকুর!—তার এ প্রার্থনা রুদ্ধ ঘরে আছাড় খেয়ে ফিরতে লাগলো,—কেউ শুনলো কিনা কে জানে? সে শুয়ে পড়লো শিয়রের প্রদীপ নিবিয়ে। তারপর আবার প্রভাতও এলো সন্ধ্যাও এলো। দিনের পর দিন আশার মাঝে বয়ে যেতে লাগলো। চোখে মুখে তাদের দুশ্চিন্তা আর ভীতি আরো প্রকট

হয়ে উঠতে লাগলো। ঠাকুর দেবতাকে তারা কতো ডেকেছে —তাঁদের কাছে কতো মানৎ করেছে,—জল দাও—প্রভু, জল দাও—তবু কি তাঁরা শুনবেন না? দেবতা যে দয়াল—তাদের এ ডাক কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? তারা আবার আশায় বুক বাঁধে, —হয়তো আজ রাতে বৃষ্টি নামবে—

সত্যি সে দিন রাতে বৃষ্টি নামলো ঝরে পড়তে লাগলো ঝর ঝর খড়ের চালের উপর। পরাণ আর সৌদামিনী দু'জনেই বেরিয়ে এলো বাইরে উঠানে। আকাশে চেয়ে দেখলো,—সে তামাটে রঙ আর নেই, সারা আকাশ কালোয় কালো হয়ে উঠেছে—সে মেঘের মাঝে হারিয়ে গেছে তারারা,—কেজানে কোথায়? মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক,—আঁধারকে যেন পরিহাস করছে—পৃথিবীর বুকে ঢেলে দিচ্ছে বন্যার মতো এক ঝলক আলো। তাদের মন আনন্দে ভরে উঠলো—দেবতারা তাদের ডাক শুনতে পেয়েছেন—না শুনে কি পারেন? ওরা যে দয়াল—গরীবের ঠাকুর! হয়তো ওই মেঘের ওপারে—বহুদূরে দাঁড়িয়ে দেখছেন পৃথিবীর মুখে প্রসন্ন দৃষ্টি মেলে! বৃষ্টি ঝরে পড়ছে ঝর ঝর—পুড়া মাটির সোঁদো গন্ধ বাতাসে ভাসছে—কি মধুর সে গন্ধ! তারা দু'জনে সেখানে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগলো।

পরাণ গেলো গোয়াল ঘরে। বলদকে খড় দিল, তারপর তাদের গায়ে পিঠে হাত বুলাতে লাগলো আদরে—চেয়ে দেখতে লাগলো তাদের দিকে তৃপ্তির সহিত। মুখে তার হাসি ফুটেছে। বললো তাদের পিঠে হাত বুলিয়ে,—খেয়ে নে বাবারা,—কাল

ভোরে আবার তোদের খাটতে হবে যে!—সৌদামিনী উঠানে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে আর দেখছে পরাণের কাণ্ড খুশি হয়ে। ভাবছে,—কাল আবার পরাণ ক্ষেতে কাজ করতে যাবে—যাবার সময় যাতে সে দুটি খেয়ে যেতে পারে—তার আজ রাতে আর ঘুমালে চলবে না,—যা ঘুম তার? ঘুমুলে একেবারে জ্ঞান থাকেনা যেন!—তারপর তাকে যা'হোক দুটো রাঁধতে হবে রাত থাকতে থাকতে—

পরাণও ভাবছে খুশি হয়ে,—তাকে কাল খুব ভোরে উঠে যেতে হবে ক্ষেতে, কাজ করতে হবে,—নইলে তারা খাবে কি? কাজে বাস্তবিক আনন্দ আছে—আর তার উপর নির্ভর করছে যখন তাদের ভবিষ্যৎ—তাদের আশাআকাঙ্ক্ষা—তাদের জীবন মরণ, তখন তাতে তার আরো বেশি খুশি হয়ে উঠবারই কথা নয় কি?

পরাণ ফিরে এসে তাকে ভিজতে দেখে বললো,—বাঃ, এখানে দাঁড়িয়ে ভিজছ যে—অসুখ করবে না?

সৌদামিনী বললো,—অসুখ আমার করেনা তো,—আর ভিজতে এতো ভাল লাগছে আজ—

দুজনই এক সঙ্গে ঘরে চললো। দুজনই খুশি—দেবতা তাদের ডাক শুনেছেন—তিনি যে গরীবের বন্ধু।

কিন্তু ঘরে ঢুকবার মুখে দুজনই থমকে দাঁড়ালো। একি, ঘরের ভিতর যে ভেসে গেছে—জলে ভিজে গেছে সবি—চালে

খড় দেওয়া হয়নি এ বছর, জল ঝরে পড়ছে অঝোর ধারে—মমতাহীন ধারায়! ঘরের সবকিছু ভিজে গেছে। এক কোণে মিটি মিটি জ্বলছে প্রদীপ—যে কোন মুহূর্ত্তে নিভে যেতে পারে,—যেন তারি মৌন প্রতীক্ষায় সময় গুনছে। সৌদামিনী শুধু একবার চাইলো পরাণের মুখে। তারপরে ঘরে ঢুকে বৃষ্টির হাত থেকে জিনিষ পত্র বাঁচাবার বৃথা চেষ্টা করতে লাগলো।

পরাণ চেয়ে দেখলো সবি,—কি করবে সে?—কাল দিনের বেলা চালে কিছুটা খড় দিতেই হবে!—কিন্তু কেমন করে? কোথায় পাবে খড় তা' সে জানে না!—

সৌদামিনী জেগে রইলো সত্যি, কিন্তু পরাণের খাবার যোগাড় করা আর হলোনা। মনটা তার বিশ্রী রকমে খারাপ হয়ে গেলো,—ঘরেও এমন কিছু নেই যে দেওয়া যায়। গরীবের ঘরে কিছু বা আর থাকে?

ভোরের আগেই পরাণ যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলো—

সৌদামিনী বললো ম্লান মুখে,—শীগ্‌গির চলে এসো—আজ আর বেশি বেলা অবধি থেকনা—প্রথম দিন কিনা আর কিছু না খেয়ে দেয়ে—

পরাণ হেসে উঠলো জোরে,—মনের ভিতরটা কিন্তু খচ্‌ খচ্‌ করতে থাকলো! তবু সে হাসি মুখে জবাব দেয়,—ই,—খেয়ে কি কাজ করা যায়?—আর আজ ত বেশি কিছু করবোও না—এই ত আসছি!—তারপর লাঙল আর বলদ নিয়ে বেরিয়ে

পড়ে মাঠের পথে—অনুভব করে পেছনে সৌদামিনীর ম্লান চোখ দুটি—মনের ভিতরটা খচ্ খচ্ করতে থাকে, তবু সে কতো খুশি হয়ে উঠে……

ধীরে ধীরে পূব দিক ফর্সা হয়ে আসে। সৌদামিনী মাঠের পথে চেয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবতে থাকে কে জানে? তারপর চলে আসে তার দিনের কাজে।

এমনি প্রভাতও আসে আবার সন্ধ্যাও আসে—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসের পর বৎসর—

শ্রীহট্ট,
১৩ই আগষ্ট, ১৯৪১ইং।

চিরকাল

অসম্ভবের পেছনে ছুটা তার খেয়াল নয়—সে জানে ওটা বিলাস, আর নেহাৎ সাধারণ ভাবেই তার জীবনে এসেছে। এ বিলাসেরও দাম আছে, মাঝে মাঝে তাই সে তার মনকে প্রশ্রয় না দিয়ে পারেনা।······

প্রত্যেক জিনিষেরই নিজের সৌন্দর্য্য রয়ে গেছে, সাধারণের মাঝেই গোপনে অসারণের প্রকাশ। তা' যদি ধরা না পড়ে ত নেহাৎ আমাদের দেখবারই ত্রুটি। সাধারণ বলেই কোন কিছু উপেক্ষার যোগ্য হ্ততে পারেনা, আর অসাধারণের জন্য যতই না ঘুরি সাধারণ জীবনের পানে ফিরে না তাকালে তার নাগাল পাওয়া যায় না। দুনিয়াটা নেহাৎ মামুলী বলেই হয়তো, আর একই জিনিয বারে বারে ঘুরে আসে বলেও হয়তো! তবু আশ্চর্য্য,—একই জিনিষ ঘুরে ঘুরে আসে দিনে দিনে, কিন্তু আমাদের চোখে তার পরিবর্ত্তন হয় নিত্যনূতন রূপের মাঝে! একই প্রভাতও আসে আবার একই সন্ধ্যাও আসে, কিন্তু রোজই তার রূপটি বদলায় না কি?

এইরূপে একই জীবনধারা পৃথিবীর বুকে সৃষ্টির আদিকাল থেকে ঘুরে ফিরে আসছে অথচ দিন দিন তার পরিবর্ত্তনও হচ্ছে—আশ্চর্য্য? পরিবর্ত্তন কথাটা যতবড়ো সত্য—নিত্যকালের এই কথাটাও তার চেয়ে কম সত্য নয়!

এমনি নিত্যকালের জীবনে আর পরিবর্ত্তনের জীবন-ধারায় একটি কুসুম তার পাপড়ি মেলে ধরে জীবনের আনন্দে আর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে আশ্চর্য্য হয়ে! আকাশের তলহীন গহ্বরে কোন অরূপের খেলা রূপের মাঝে আত্মপ্রকাশ করে কে জানে? নিত্যকালের রক্তস্রোতে পরিবর্ত্তনের ছোঁয়া লেগে নেশা ধরে আসে ধীরে ধীরে!

এমনি করে পরিবর্ত্তনহীন সংসারে মোক্ষদা বেড়ে উঠে। লেখাপড়া সে না শিখলেও কাজ কর্ম্ম নিখুঁত ভাবেই সে করতে পারে। সাধারণ গৃহস্থ তারা—কোন রকমে দিনের পর তাদের দিন চলে যায়। বাবা গোকুল ক্ষেতে কাজ করে,—মা রোগা, মেজাজ একটু খিট খিটে,—ভাই আনন্দ,—একেবারে অকর্ম্মা, সারাদিন ট ট করে ঘুরে বেড়ায়.—নেশাও করে গাঁজাগুলি খেয়ে হয়তো—যাত্রার দলে থাকে—মাঝে মাঝে বাড়ী আসে নেহাৎ পেটের দায়ে,—আবার খেয়েই মোক্ষদা বা মার কাছে দু'এক পয়সা যা' আছে নিয়ে চলে যায়,—ভয়ানক ব্যস্ত, যেন এক্ষুনি না গেলে লাখ টাকার ক্ষতি হবে,—সে ভয়ানক কাজের লোক কিনা আর সে উপস্থিত না থাকলে কোন কিছু ঠিক মত হয় না,—তার উপর সব কিছুই নির্ভর করে সত্যিইত! তার বাড়ী বসে থাকবার ফুরসৎ কই? গোকুল ক্ষেতেও কাজ করে আর কাজ করে জমিদার বাড়ীতে। মোক্ষদা বাড়ী বসে বসে যা করা যায় তার সবই করে—রান্না, ঘরদোর পরিষ্কার রাখা, ছোট ভাইবোনদের খাবার যোগাড়, এমন কি ধান ভানা

পর্য্যন্ত! তার গায়ে জোর আছে, তা ছাড়া শত অত্যাচারেও তার অসুখ-বিসুখ বড় একটা করেনা,—বয়স পনেরো ষোল—বয়সের মাদকতায় দুটি বড়ো বড়ো কালো চোখ ভরা,—মাথায় জমাট কালো চুল, মুখের চারদিকে ছড়ানো ইচ্ছা করেই হয়তো, —মুখটা তার বড়ো, আর সে বড়ো মুখকে তাতে খুবই সুন্দর লাগে—নিটোল স্বাস্থ্য—দেখলে লোভ হয় এমনি! সে এমনি সুন্দর হয়ে উঠলো যে সবাই তার দিকে চেয়ে দেখতো, —তাদের সে দৃষ্টিতে কি থাকতো কে জানে—প্রশংসা না আর কিছু? মোক্ষদা এইরূপে নানা-ধরণের কাজের খাটুনির মাঝেও আকাশে তার পাপড়ি মেলে ধরে। সে জানে,—তার দুঃখের জীবন। এই সংসারের কঠোর কাজের মাঝে, বাপ মা, ভাই বোনের সুখ দুঃখের ভাগ তাকে বইতে হবে, এ থেকে সংসার তাকে রেহাই দিবে না। তবু এরো বাইরে আর একটা জীবন তার আছে। সেটা সে পায় কল্পনায়,—সেখানে থাকে আলোর দেশের রাজপুত্র তারি প্রতীক্ষায় বসে,—এ এক আনন্দের দেশ। সে জানে, এসব হয়তো সত্যিকার জীবনে রূপ পায় না, হয়তো আজগুবি,—তবু তা কতো মধুর! এই ধরণে সে দুটো জীবনের মাঝে দাঁড়িয়ে,—যেমন আর সবাই—সকল মানুষই! তবু সে জানে,—এই অসম্ভবের পেছনে ছুটা বিলাস, —কিন্তু তা হলেই বা কি ক্ষতি?—এমনি করে যদি মানুষ শুধু কল্পনার রাজ্যে বাস করতে পারে জীবনটা কতো সুখের হয় তা হলে? বিলাস হলেও এতে সে মনকে প্রশ্রয় না দিয়ে

পারেনা। আর এরকম করে বেঁচে থেকে বাস্তবের আঘাতকে মানুষ এড়িয়ে চলতে পারে কতো সহজেই? তবু এ থেকে নেমে আসতে হয়, দিনের পর দিন তার অভাব-অনটন নিয়ে দেখা দেয়, আর তা' কেটেও যায় একই ভাবে! আর এরি মাঝে সেও বেড়ে উঠে দ্রুত তার সৌন্দর্য্য-লীলায় দেহ ভরে।

গোকুল মেয়ের দিকে চেয়ে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে, এই অভাব অনটনের সংসারে হাড়ভাঙা খাটুনির মাঝে এতো দ্রুত—এতো সুন্দর হয়ে সে বেড়ে উঠলো কেমন করে? তারপর···তার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে, মেয়ের পানে সে চেয়ে দেখতে পারেনা, মনে তার দুর্ভাবনা জাগে,—কি আছে ওর ভাগ্যে কে জানে? —সে চোখ ফিরিয়ে নেয়।

•

তারপর একদিন সত্যি সত্যি তার কল্পনার দেশের রাজপুত্র আসে মোক্ষদার জীবনে! সেদিন আনন্দ প্রকাশকে নিয়ে এলো। প্রকাশ গানের দলেই থাকে—যাত্রার দলে রাজা সাজতো সে।

সেদিনকার আকাশ ছিলো পরিষ্কার—বাদলের পর রোদ উঠেছে, জল জমেছে খালে নালায়। বাতাস বইছে সেদিন মৃদু, আকাশ নেমে এসেছে মাঠের সীমায়,—গাঢ় নীল আকাশ খানি! মাঝে মাঝে সাদা ছোট ছোট মেঘের টুকরা আকাশের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধানের সবুজ ক্ষেতে এসেছে যৌবন, শরতের জলভরা নদীতে জোয়ার এসেছে, আর যৌবনভরা দেহে মোক্ষদা কাজ করছে উঠানের এক পাশে সব্জি বাগানে। সকাল

বেলার সোণালী রোদ উঠানের বুকে চিক চিক করছে ভিজা মাটি আর ঘাসের উপর। মোক্ষদার বয়স পনেরো বা ষোল,—কুমারী মেয়ের বিয়ের বয়স! লম্বা সে একটু, নিটোল স্বাস্থ্য, বড়ো মুখ। কাজ করছে সে,—তার শরীরের সৌন্দর্য্যময় ভঙ্গি রূপ পেয়েছে কাজের মাঝে। মন তার কোথায় কে জানে,—কার সন্ধানে ফিরছে, তবে মাটির ধরায় যে নয় সে ঠিক! বাইরের সৌন্দর্য্য তার অন্তরের রঙীন স্বপ্নের তলায় ম্লান হয়ে আছে। পরনে তার ময়লা কাপড়, আঁচল কোমরে বাঁধা, কাপড়খানা তার দেহের পরিমাণে ছোট, গায়ে লেপ্টে আছে—লজ্জা নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তারি ফাঁকে দেহের নগ্ন পুষ্ট সৌন্দর্য্য বেরিয়ে আসছে আধা-ঢাকা রহস্যের মতো,—চোখের আড়ালে যা' গোপন রয়ে যায় তা' পুরণ করে নিতে হয় কল্পনা দিয়ে। তাইতেই বোধহয় আধা-খোলা সৌন্দর্য্য আমাদের মনকে এতো বেশি নাড়া দেয়—এমন করে আকর্ষণ করে আমাদের মনকে,—মুগ্ধ করে! আলো-আঁধারের খেলায় মন সুন্দরের সন্ধান পায়—তারি মাঝে ডুবে থাকে!

আনন্দ প্রকাশকে নিয়ে আসে। প্রকাশ চেয়ে থাকে মোক্ষদার দিকে তার কৌতূহলী বড়ো বড়ো চোখে। মোক্ষদা সে দৃষ্টির আঘাত তার শরীরে অনুভব করে,—সংকোচিত হয়ে আসে তার দেহ। অতি সাধারণ জিনিষ এ, তবু তা তার জীবনের ভিত্তিমূলে করে আঘাত। বুকের ভিতর জেগে উঠে আসঙ্গ-লিপ্সা—যা' জন্ম জন্ম ধরে সঞ্চিত হয়ে আছে মানুষের

জীবনে,—মানুষের বুকে যা' নাড়া দিয়ে আসছে নিত্যকালের রক্তধারায় আর তার অসংখ্য পরিবর্ত্তনেরো মাঝে। মোক্ষদা ভালবাসে,—তার জীবনে নূতন প্রকাশের আনন্দ দেয় দেখা।

প্রকাশেরও চোখে নেশা ধরে—তারো মনের কোণ রাঙিয়ে উঠে। তারপর তাদের বিয়েও হয়ে যায়। প্রকাশের অবস্থা মোটের উপর ভালো, আর গোকুলের পক্ষে এর চেয়ে ভাল বর যোগাড় করাও হয়তো সম্ভব নয়। প্রকাশ একটু নেশা হয়তো করে—তবে ওটা নেহাৎ বয়সের দোষ, বয়স বাড়লেই শোধরে যাবে। যৌবনের ইতিহাসে কালোদাগ্ কারই বা আর না থাকে? তবু মেয়েকে স্বামীর ঘরে পাঠাতে গোকুলের বুক ফেটে যায়,—ওই মেয়েটিই যে তার সব—তার সব কাজে সহায়! দুঃখের জীবন যে তার ওই মেয়েটিই সুধার প্রলেপে ভরে দিতো—সমবেদনায় মুছে নিতো তার বুকের ভিতরের অসহ্য যন্ত্রনা,—ওই মেয়েটিই যে তার সংসারকে পুণ্যপরশে ভরে রাখতো। সে তো জানে,—কতদিন মোক্ষদা নিজে কিছু খায়নি—তার ভাগ্যে একমুঠো অন্নও জুটেনি আর সবাইকে দিয়ে; তবু খাওয়ার ভান করেছে! সে সবই বুঝেছে,—তার চোখকে কি ফাঁকি দেওয়া চলে? কিন্তু তবু তাকে ভান করতে হয়েছে যেন সে কিছুই বুঝেনি—বুকের ভিতর সে কি অসহ্য যন্ত্রনা নিয়েই না তাকে ফিরতে হয়েছে,—অসহায়ের যন্ত্রনা! মেয়ের মুখে সে ভাল খাবার দিতে পারেনি--পরনে দিতে পারেনি কাপড়,—সে শুধু খেটেই গেছে মুখ বুজে—কোন

নালিশ নেই —তার যেন কিছুই চাইনা! গোকুল ভাবে, তার চোখ অশ্রুর বন্যায় ভরে উঠে।

তবু সে তাকে ধরে রাখতে পারে না তো,—মোক্ষদাকে? তার কি অধিকার আছে তাকে দুঃখের মাঝে পিষে মারবার? —সে তার স্বামীর ঘর করবে—সুখী হবে,—গোকুল খুশি হয়ে উঠে। —ওই সুন্দর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে,— গোকুলের মুখে ভেসে উঠে তৃপ্তির হাসি!

শ্রীহট্ট,
সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ইং।

ফণীমনসা—

বর্ষাকাল, বিকাল বেলা। আকাশ কালো মেঘে ঘেরা। সন্ধ্যার এখনো দেরি আছে,—দেখে মনে হয় সন্ধ্যার আঁধারেই যেন ধরণী ম্লান হয়ে আসছে। গ্রামের পথে চলেছি, ছ'ধারে ফণীমনসার সারি—উঁচু, তার পাতাহীন কাঁটাভরা শাখা প্রশাখায় দাঁড়িয়ে আছে—ঘনবিন্যস্ত, যেন সারি সারি সবজে-কালো সাপ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে মাঝের সরু পথটাকে আগলে আছে। ছধারে কাঁচামাটির দেওয়াল ঘেরা বাড়ী,—মাটির ঘর, খড়ের চাল,—মাঝে মাঝে কেরোসীন টিনে ছাওয়া—আলকাৎরার মতো কালো রঙ চালের। বাড়ী ঢুকবার পথে ফাঁক—ছধারেই যেন হঠাৎ থেমে গেছে ফণী-মনসার সে নিবিড় বেড়া। ছ'ধারেই গাছের মাথায় ঝুলছে বড়ো বড়ো নীলাভ বেগুনী রঙএর ফণীমনসা ফুল, পাশে ঝুলছে সাদা কুঁড়ি—যার ভেতর প্রকাশের অপেক্ষায় বসে আছে ঘুমন্ত রূপের কন্যা, কালই প্রভাতের আলোয় জেগে উঠবে বলে! ভিজা ফুল আর কুঁড়ি বোটা থেকে নীচের দিকে ঝুলছে, চমৎকার! আর চমৎকার সে ফণীমনসার বড়ো বড়ো ফুলগুলি,—নীলাভ বেগুনী রঙএর। তাদের বিষাক্ত নিশ্বাস যেন ছধারের আবহাওয়াকে ম্লান করে

রেখেছে,—দেখে তাই মনে হয়,—হয়তো এ সংস্কার। কতো সুন্দর,—আর এর ভেতরটা বিষের প্রলেপে ভরা—সুন্দরের বুকে জমাট কালো নোংরামির বিষবাষ্প—পবিত্র প্রকাশের বুকে অপবিত্রের জঘন্যতা, –ভাবতে কষ্ট হয়, মনে আঘাত লাগে, মন সংকোচিত হয়ে উঠে! তবু একে অস্বীকার করবার উপায় নেই, কিন্তু এ কেমন করে হয়?

গ্রামের পথ, ভিজা ঘাসের ফাঁকে কাদা উঁকি দিচ্ছে——মাঝে মাঝে ভাঙায় হাটুজল আর কাদা। সাধারণতঃ গ্রামে যাইনা—-বর্ষায় তো নয়ই! গ্রামের প্রতি বিতৃষ্ণায় নয়—আর ম্যালেরিয়াও আমার কোনদিন হয়নি,—কাদার ভয়ে। রাস্তায় কাদা, বাড়ীর পথে কাদা, উঠানে কাদা,—সব জায়গায়ই গলা পৃথিবীর নরম বুকের স্পর্শ লাগে পায়ের তলায়। পৃথিবীর রূপ দেখেছি—কঠিন কালো পাষাণের রূপ! এ সবুজ নবম গলা মাটির স্পর্শ তাই হয়তো অসহ্য ঠেকে!

এগিয়ে চলেছি। এ আমার চেনা পথ—ছোট বেলায় এ পথে চলেছি,—কতোবার! ক্রমে গ্রামের প্রান্তে বড়ো দীঘির ধারে মস্তবড়ো তেঁতুল গাছের নীচে এসে দাঁড়ালুম। দূরে মাঠের বুকে কালো মেঘের ছায়া নেমেছে—দীঘির জলে পড়েছে কালো মেঘের ছায়া! ম্লান হয়ে আছে সব কিছু—জলোহাওয়া ভেসে আসছে মাঠ হতে,—কতোদূর হতে কে জানে!

দীঘির ওধারে ওই দেখা যায় যদুকামারের বাড়ী বড়ো বটগাছের ছায়ায় ঢাকা। একটা ভিটা খালি,—আরেকটা ভিটায় একখানা ঘরের কাঠামো খাড়া—চালের অর্দ্ধেক হয়তো বোশেখের ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে! ঘরের উপর লম্বাভাবে পড়েছে এক সুপুরি গাছ—পাতাগুলো লাল হয়ে আছে,—ঝরে যায়নি! এও হয়তো ঝড়েরি নিষ্ঠুর অভিযানের মৌন সাক্ষী।

ওবাড়ী আমার খুবই পরিচিত! ওখানে থাকতো যদুকামার, আর সুদামা—তার স্ত্রী। যদুকামার লোহার কাজ করতো,—সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ, কথা বড়ো একটা কইতোনা, তবে সব-কিছুতেই হাসতো—সেও বড়ো করে নয়! সুদামা খুবই সুন্দর ছিল। বয়সে আমার চেয়ে দু'তিন বছরের বড়ো হলেও আমার তাকে ভালো লাগতো। ভারি অদ্ভুত ছিল তার গড়ন—আর মুখেও খেলতো অদ্ভুত হাসি। সে যখন হাসতো আমার মনে হতো তার সমস্ত শরীরই যেন হাসছে—হাসির ঢেউ তার গায়ে লেগে একটা সুন্দর ভঙ্গির সৃষ্টি করতো,—একটা সুন্দর সম্পূর্ণ আকার পেত তার মাঝে। এ যেন একখানি হাসি—একেবারে নিখুঁত! আমি প্রায় রোজই ওদের ওখানে বেড়াতে যেতাম—ওরা যেন আমাকে আকর্ষণ করতো! বসতাম একটু দূরে এক জলচৌকির উপর। সুদামা কতো কি বলে যেতো—পাশে বসে যদু কাজ করতো আর আমাদের দিকে প্রসন্ন হাস্যে চেয়ে দেখতো। আমার

আজো মনে পড়ে—সুদামা এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয় আর জিনিষের নাম করতো যার অস্তিত্ব এ মাটির ধরায় নেই। আমি দূরে বসে বসে শোনতাম আর আমার মন কৌতূহলে ভরে উঠতো। এই কৌতূহলই কি আমাকে টেনে আনতো,—আর কিছুই কি ছিলনা? তার পর হঠাৎ একসময়ে আঁধারে গা ঢেকে বাড়ি গিয়ে পড়ায় বসতাম। বাবা যাতে এসব টের না পান—আমার এই ওখানে যাওয়া,—সে দিকে ষোল-আনা নজর ছিল। আমি ওখানে যাই জানলে আমার কি আর রক্ষে ছিল—ওরা ছোটলোক কিনা, আর আমি হলাম ব্রাহ্মণের ছেলে!

সুদামা মাঝে মাঝে আমাকে দীঘির পারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলতো,—কি দেখছো ঠাকুর,—ওখানে—ওই দীঘির জলে? আমি বলতাম,—কিছুই না তো—অমনি চেয়ে আছি। সে বলতো,—আমার কিন্তু ওই কালো জলে চেয়ে থাকতে ভারি ভালো লাগে,—দেখো ঠাকুর,—আমি একদিন ওই জলে ডুবেই মরবো।—তারপর হয়তো আমার কাছে এসে একটু তফাতে বসতো—মুখ তার অদ্ভুত হাসিতে উঠতো ভরে। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবতাম,—ওই কালো জলের সঙ্গে সুদামার দু'টি কালো চোখের কতো মিল!

মাঝে মাঝে যদুর ওখানে তার এক তরুণ আত্মীয়কে দেখতাম। সে সহরে থাকে,—সুন্দর পোষাক, হাতে ঘড়ি, গায়ে সিল্কের জামা······

যদু আজ আর নেই। সামনে তাদের ভাঙা বাড়ী আজো ঠিক আগের মতই দাঁড়িয়ে আছে। সে নাকি না খেতে পেয়ে মারা গেছে। গ্রামের লোকে বলে,—সে ছিলো ভারি অকেজো অলস। ঘরে বসে থাকলে কি লোক খেতে পায়? তাইতো সে ঘরে বসে বসে খেতে না পেয়ে শুকিয়ে মরেছে!

আমি তখন গ্রামে ছিলাম না। তবু আমি তার বিষয় ঠিক অন্যভাবে জানি, আর তাই হয়তো সত্য! তাদের জীবন-যাত্রার নমুনা আজো আমার চোখে জীবন্ত হয়ে আছে, আর তার পরের ইতিহাস শুনলেই সেটা আমার চোখে আরো স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠে। ভেসে উঠে যদুর অনাহার-ক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখচ্ছবি—যা' দিনে দিনে তার মুখে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়েছে—মরণকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে তার জীবনে! তবু সে একদিনও বাড়ী ছেড়ে কোথাও বেরোয় নি—সেখানে সে সুদামার প্রতীক্ষায় দিন গুণেছে ঠিক মরবার আগের দিন অবধি। কেউ কাজ নিয়ে এলে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে,—কেন সে আর কাজ করবে?—কার জন্যেই বা? তারপর একদিন ধীরে ধীরে ঝরে পড়েছে,--ধীরে ধীরে মরণ তাকে গ্রাস করেছে,—চারদিক থেকে ধীরে ধীরে আঁধারে ঘনিয়ে এসেছে—আর তারি মাঝে সে দিয়েছে ধরা,—না খেয়ে শুকিয়ে মরেছে সে,—কিন্তু কেন?

একদিন রাতের আঁধারের মাঝে সুদামা হয়তো হারিয়ে গেলো,—আর ফিরে এলো না! সে দীঘির জলে ডুবে

মরলো কিনা কে জানে? গ্রামের লোক ভাবে সে ভালোই আছে। তা' যাই ভাবুক,—কে জানে সে কোথায় আছে?—সহরে না দীঘির জলের কোন অতলে?

যদু তাকে ভালবাসতো,—একান্ত করে সে ভালবাসতো তাকে! প্রথমটা সে বিশ্বাসই করতে পারলো না। তারপর হয়তো তার খুবই রাগ হলো—ভাবলো সে,—যাক্‌না ও যেখানে খুশি, তাতে তার কি? গ্রামের লোকে কতো কি বললো,—হয়তো সে বিশ্বাস করলো,—হয়তো না!—গ্রামের লোকের কথা? একটু সুযোগ পেলেই ওরা লোকের নামে কুৎসা রটাবে, এই ওদের স্বভাব,—ওসব ধরলে কি আর সংসারে বাস করা চলে এই—গ্রামের লোকের কথা?—সে হো হো করে হেসে উঠলো। তবে এবার ও ফিরে এলে তাকে আর সে ক্ষমা করবে না, কেন সে এমন করলো—এমন একটা কেলেঙ্কারী ব্যাপার—যা নিয়ে যার যা খুশি বলছে? সুদামা কিন্তু তার কৈফিয়ৎ দিতে ফিরে এলো না—দিনের পর দিন চলে যেতে লাগলো। যদু তবু ভাবলো,—ও একদিন ফিরে আসবেই—না, আর কেউ না জানুক সে তো সুদামাকে জানে—সুদামা কি এ করতে পারে? ফিরে সে আসবেই—না এসে পারবে কেন? ও এলে প্রথম সে কথাই কইবে না! তার মন অভিমানে ভরে এলো,—সুদামা কেন এমন করলো,—কেন এমন করলো সে! দিনের পর দিন বয়ে চললো। যদু নিজেকে ঘরে একেবারে বন্ধ করে ফেললো—বাইরে আর

আসে না। অধীর প্রতীক্ষায় তার দিন কাটতে লাগলো। কাজে এলো তার বিতৃষ্ণা,—লোক সমাজের যেন সে কেউই নয়, আহার-নিদ্রা সে একেবারে ছেড়ে দিলো। তবু সে বিশ্বাস ছাড়তে পারলো না যে সুদামা একদিন ফিরে আসবেই। ধীরে ধীরে মৃত্যু তার অন্ধকার যবনিকা তার উপর টেনে দিলো,—কে জানে তার এ প্রতীক্ষা সার্থক হয়ে উঠলো কি না, তার এ ভালোবাসার পরিণামে সে কি পেয়েছে?

সেখানে বসে বসে ভাবছি, রাতের আঁধার যে ঘনিয়ে এসেছে টের পাইনি। মেঘ করেছে চারদিক ঘিরে একেবারে আঁধারে ঢেকে। গায়ে বৃষ্টির ছিটা—লাগতেই চমকে উঠলাম। সামনে চেয়ে দেখলাম,—দীঘির কালো জল অন্ধকারে ঢাকা—ঠাহর করা যায় না। দ্রুত ফিরে চললাম বাড়ীর পথে। ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামলো অবিরল ধারে। বিদ্যুতের আলোয় দেখলাম,—ফণীমনসার ফুল হাসছে!

শ্রীহট্ট

সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ইং

রূপক —

মানুষের ধরণ যেমন আলাদা তেমনি তার মনও অদ্ভুত। কতো রকমের মানুষ আমরা রোজ দেখি আর তার মানসিক বৃত্তি নিচয়েরও কত রকমের বিকাশ! মানুষ যে চিরদিন তার চিরাচরিত পথেই চলবে তার কোন বাঁধাধরা নিয়ম থাকতে পারে না অথচ যখনই আমরা দেখি সে নিয়মের ব্যতিক্রম তখনই তাকে পাগলামির ছাপ মেরে চালিয়ে দিই। তাই বলে যা' সত্য 'তা' সত্যই কিন্তু রয়ে যায়,—গ্রহণ করতে পারিনা বলে—মনে আঘাত পাই বলেই তা' মিথ্যা হয়ে যায়না। এদিকে কু-ই হোক আর সু-ই হোক সংস্কারের প্রয়োজনকেও অস্বীকার করা যায়না তো।

মোহন যখন আরতিকে বিয়ে করে তখন তার বয়স ছাব্বিশ। আরতি তার বছর দশেক ছোট। দুজনেই দেখতে ভালো ছিল আর তাদেরে মানিয়েছিলোও বেশ! গ্রামের লোক তখন তাদেরে দেখে কি বলেছিল আজ মনে নেই,—অনেক পুরানো কথা কিনা!

তাদের বিয়ের পর আরো বাইশ বছর কেটে গেছে। তাদের দাম্পত্য জীবন যে সুখের সে বিষয়ে বাইরের লোকের

মনে কোন সন্দেহই নেই তবে তারা নিজেরাও তা ভাবে কিনা বলা কঠিন! তা তারা না ও ভাবতে পারে, তবে মুখে বিশেষ কিছু বলতে কোনদিন শোনা যায়নি। আর পেছনে ফেলে আসা অতীত দিনগুলোর দিকে তারাও হয়তো লুব্ধ চোখে ফিরে তাকায়, হারানো দিনের মমতায় মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাসও আসে বেরিয়ে,—অতীতটা সব সময়ই মধুর! তাদের বিয়ের সময়কার কথা বা তারো পরের তাদের প্রথম জীবনের কথা মনে করে রাখবার মতো খুব বেশী লোক আজ আর নেই, তবে তা' মনে করে না রাখলেও বিশেষ যায় আসে না! আজ যা' নবদম্পতির জীবনে আসে,—চঞ্চল খুশি, হটাৎ সমস্ত জগৎটাকে ভালো লাগা; সব কিছুতেই রঙলাগা দেখা, সব কাজেই আনন্দ আর মনের বিপুল ঔৎসুক্য, একে অন্যকে জানবার একান্ত আগ্রহ—একান্ত করে নিজের মাঝে ধরে রাখবার ইচ্ছা,—সমস্তই তাদের জীবনের পুনরাবর্ত্তন মাত্র, তাদের জীবনের প্রথম দিনগুলিই আবার অন্যদের জীবনে ঘুরে ফিরে আসছে! তাদের সে জীবন শেষ হয়ে গেলেও দিনগুলি কিন্তু ঠিকই আছে। তার পরও তাদের সে দিন-গুলোকে মনে করে রাখবার প্রয়োজন আছে কি? আজো তাদের বিগত দিনের স্মৃতির দিকে তারা ফিরে তাকায় যখন কারো চোখে সে দিনের দৃষ্টি ঝলসে উঠতে দেখে। তবু মনে হয়, —কোথায় যেন মিল নেই। তাদের জীবনে হয়তো কিছুটা বাকি ছিলো তখনো···

তাদের জীবনে পরিবর্ত্তন হয়েছে প্রচুর, কালের ছাপ পড়েছে তাদের শরীরে; বাইশ বছর আগের বরকনে আর তারা এক নয়। মোহনকে বয়সের চেয়ে বড়ো মনে হয়—অনেক বড়ো! বেশির ভাগ সময়ই বসে থাকে বাইরের ঘরে এক ইজিচেয়ারে ডুবে। আরতিকে কিন্তু দেখায় ঠিক অন্যরূপ! ছোটখাট শরীর—সুন্দর গড়ন—বেশভূষা করলে ছোট্ট মেয়েটিরই মতো দেখায়। শুধু তার গতির চাঞ্চল্য একটু কমে এসেছে মাত্র! তবু তাকে নববধূর আসরে একেবারে বেমানান দেখাবে না। বাইশ বছর আগের রূপ আজো বয়সের রেখায় মুছে যায়নি, তবে তা' নিস্তেজ আর জীবনের অভাবে হয়তো একটু মলিন ও। তাদের এ বাইশ বছরের পরিবর্ত্তনের মাঝে ছেলেমেয়েদেরও আবির্ভাব হয়েছে।

আরতির জীবন ধারা ভারি মজার! সে যা' পেয়েছে তার বেশী সে কোনদিন চায়নি। যা' পেয়েছে তাতেই সে নিজেকে খুশি ভেবেছে, যেন এতটুকুই তার প্রয়োজন,তার বেশি তার যেন আর কিছুই চাইনা—সংসার তাকে যা' দিয়েছে তাই তার প্রাপ্য—এর বেশি তার ভাগ্যে মিলে ভালো, না মিললেও কোন ক্ষতি নেই! অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়ানো তার বিলাস নয়,—আলোকের মাঝে সে যা' পেয়েছে তাতেই সে খুশি—যা' জ্বল্ জ্বল্ করে ফুটে উঠেছে তার জীবনে পরিষ্কার স্বচ্ছ হয়ে। এক কথায় তার জীবনে রোমান্স গড়ে উঠেনি। রোমান্স হয়তো জীবনের বিশেষ কোন স্তরে একটা বিশেষ

বয়সে গড়ে উঠে,—কল্পনাপ্রবণ মনে লাগে তার ধাক্কা। সে বয়সটা আরতির জীবনেও এসেছিলো ঠিকই, তবে যোগানের অভাবে অজান্তে বয়ে গেছে, আর তার মনটা নেহাৎ কল্পনাপ্রবণ নয় বলেই তাকে সে ধাক্কা সামলাতেও হয়নি! ওটা মনের জিনিষ, আর মনের দিক দিয়ে এর অনুভূতি—এর আনন্দের দাম কষাও মোটেই সহজ নয়—হয়তো অনেক—আর এর প্রয়োজনও হয়তো আছে! তবু যে পায়নি, না পাওয়ার অভাববোধটুকু পর্য্যন্ত যার চেতনায় নেই—তার কাছে এর দাম কতটুকুই বা? তবু এরো অভাবে হয়তো জীবনের পুরোপুরি জাগরণ হয়না,—হয়তো এরি অভাবে আরতির ভেতরকার নারী জেগে উঠেনি আজো।...

তাদের বিবাহের বাইশ বছর পরে এক বসন্তের প্রভাত। চঞ্চল হাওয়ায় মাঠের বুকে দোলা জাগে,—ভাবতেও লাগে আরাম! আকাশের রূপ প্রভাতের আলোর মাঝে দেয় ধরা আর পৃথিবীর বুকে জাগে প্রকাশের একঝলক আনন্দ! আরতিও এ প্রভাতে যেন সচেতন হয়ে উঠে। তার জীবনের নব জাগরণের পথে মুকুলের আবির্ভাব—এ যেন এক স্বপ্ন......

মুকুলের বয়স কুড়ি বছর, কলেজে পড়ে। শরীর লম্বা, ছিপ ছিপে গড়ন, হাত পা ছোট ছোট। রঙ ফর্সা—যেমনটি সচরাচর চোখে পড়েনা। কালো ভ্রূর নীচে নিস্তেজ পাঁশুটে চোখ, যাতে মাঝে মাঝে একঝলক ঔজ্জ্বল্য ঝলে উঠে

কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই মনে হয় ভাবলেশহীন! রুক্ষ বড়ো বড়ো চুল,—কটা, কালো নয়,—পাছের দিকে টানা। ছোট্ট মুখ মাংসহীন—সাদা—রক্তহীন ফ্যাকাশে! মুকুল আধুনিক সাহিত্যিক, আরতিদের পাশের বাড়ীর ছেলে, ছেলেবেলায় আরতির কাছে মায়ের আদর পেয়েছে। দশ বারো বছর বাইরে ছিল—আজ আর তা' তার মনে নেই, আর থাকলেও তা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে।

সাহিত্যিক সে সত্যি আর সেটা তার অজানাও নয়। সে নিজে নিজেকে কোনদিন ছোট করে দেখেনি। সে জানে সে জন্ম নিয়েছে সাহিত্যিক প্রতিভা নিয়ে যে প্রতিভার মালিক সেই একা,—এ জগতে এতবড়ো প্রতিভা নিয়ে আর কেউ জন্মায়নি কোনদিন; সে জানে সে সাহিত্যিকের বংশধর, অতীতের চিন্তাধরায় সে জন্মেছে—ভবিষ্যতের চিন্তাধারায় সে বেঁচে থাকবে যুগ যুগ ধরি'! কতো কিছু তার মাঝে ফুটে উঠতে চায়--চায় তার মন হতে ছিটকে পড়তে মাটির ধরায়,—যতো সব আলোর শিশু! সে তা'দের জন্ম দিবে, সে হবে সৃষ্টিকর্ত্তা,—সে আনন্দে সে পাগল হয়ে উঠে।

সাহিত্যের আসরে তার নামও আছে। ভয়ানক মন ভোলা সে, অথবা তারি ভাণ করে! চুরুটে টান দিয়ে তারপর টান দিতে ভুলে যায়, টাকাকড়ির কোন হিসাব থাকে না, বই হয়তো ফেলে আসে বন্ধুদের ওখানে তবে হারায় না, কথা বলছে হঠাৎ উঠে পড়ে তারপর আবার বসে! বলতে বলতে

হঠাৎ বাইরে তাকিয়ে থাকে, কি বলছিলো ভুলে যায়,—তারপর কবিতা আওড়াতে করে স্থরু। অনেক সময়ই তার এ ভাব-বৈচিত্র মানুষের চোখে অশোভন ঠেকে তবে সে বড়ো একটা খেয়াল করে না। কথা বলে সে শব্দ চয়ন করে তার নিজস্ব ভঙ্গিতে, রাস্তায় চলে হাতে কালো বড়ো বই, হাটে যেন ঢেউএ ঢেউএ সামনে ঝুঁকে—যেন তারি আপন খেয়ালে সে চলছে। চাল চলনে সে দস্তুরমত সাহিত্যিক; শুধু একটা জায়গায় সে সাহিত্যিকদেরে হারিয়েছে, সেটা হলো,—লেখা-পড়ায় তার খেয়াল আছে! পরীক্ষার কাগজে তার নম্বর অনেক সময় সকলকেই ছাড়িয়ে যায়। তবু সে জানে,—এ সব লেখাপড়া করে যারা গাধা তারা—এ তার মতো সাহিত্যিকের কাজের কোঠায় বেমানানই।

সে একটু ভাবপ্রবণ। সেদিন তো সে কেঁদেইছিলো। অসুখ করেছে—ঔষধ খেতে হবে। এসব হাঙ্গামা কি তার পোষায়—এই ঔষধ ঢেলে খাওয়া? মা বোনরা আছে কিন্তু কারো যেন এদিকে মোটে খেয়ালই নেই! হঠাৎ তার মনে হলো,—সকল থাকতেও যেন তার কেউই নেই, জগতে সে একা! মনে তীব্র বেদনা জেগে উঠলো, সে কেঁদে ফেললো। মুহূর্ত্তের অনুভূতি, তবু তারো গভীরতা কতো!

মুকুল হয়তো কাগজ পড়ছে, চা দেওয়া হয়েছে তাকে। চুমুক না দিয়েই বলবে,—এমনতরো বিশ্রী চা কি খাওয়া যায়। বদলে দিলে বলবে চুমুক দিয়ে,—আগেরটাই ফিরিয়ে দিলে

বুঝি ; নয়তো বলবে ঃ যা' কালো রঙ হয়েছে—নিয়ে যাও ওটা,—নিয়ে যাও—হাঁকবে জোরে—দিবে হাতদিয়ে ঠেলে কিছুক্ষণ পরে এই চাই চুমুকে চুমুকে নিঃশেষ করে ফেলবে তারি অজান্তে! বন্ধুরা এসব চেয়েই দেখে,—তার কোন কাজে বাধা দেয় না।

মাঝে মাঝে সে গম্ভীর হতে চেষ্টা করে কিন্তু একটু পরেই সে খেয়াল আর থাকে না, আরো বেশী চঞ্চল হয়ে উঠে। চোখ চায় ধারাল করতে—হয়তো বা এক ঝলক আগুন ফুটে উঠে, তারপর আবার তা নিস্তেজ হয়ে আসে, চোখ দুটি হয়ে পড়ে ভাবলেশহীন বোকার মতো—প্রতিভার আলোকে দীপ্ত হয়ে উঠে না।

সে জানে,—সে কোন বিশেষ দেশের নয়, সমস্ত জগতের ভাবধারার সে প্রতীক। কোন সমাজের বিশেষ কোন পরিধির ভিতর তার অস্তিত্ব বাঁধা পড়ে নেই,—সে জগতের মহামানব-সমাজের ছিটকে পড়া আলোর টুকরা জীবনের স্পন্দনে নড়ছে! জগতের যে কোন দেশে—যে কোন সমাজে নিজেকে সে খাপ খাইয়ে নিতে পারে যেমন খুশি,—যেমন খুশি সে চলতে পারে মানুষের হাতে গড়া নিয়ম কানুনকে অগ্রাহ্য করে যা' মানুষের স্বাভাবিক প্রকাশের পথে অহরহ নিষেধের মতো দাঁড়িয়ে আছে,—সে ভেঙে গুড়ো করে দিতে পারে সে সবকিছুকে! সে বন্ধনহীন,—সে মুক্ত!

তবু সত্যি সত্যি সে সাহিত্যিক,—সে ভাবুক, ভাবপ্রবণ, প্রতিভাবান্ আর অস্থির !

সে বারের বসন্ত ঠিক আগের বারের মতই ছিল কিনা তার হিসাব অনর্থক, তবে তা' সেবার যেভাবে দুটি জীবনে নাড়া দিয়েছিলো তেমন করে আর কোনবার যে দেয়নি এ অতি সত্যি কথা !

প্রায় বারো বছর পরে এক বসন্তের প্রভাতে মুকুল ফিরে এলো তার জন্মভিটায়, কেন সেটা সেই জানে। সেদিন বসন্তের রঙধরা আলোর মাঝে তার চোখে হলো নূতন প্রকাশ ! বাড়ী যাওয়ার পথে সে দেখলো আরতিকে দাঁড়িয়ে থাকতে প্রভাতের আলোর মাঝে তার ছোট্ট সুঠাম দেহে নিয়ে রূপের দীপ্তি ! এতো শান্ত রূপ,—মুকুলের মনে হলো,—সে জীবনে কোনদিন দেখেনি ! আরতি তারি দিকে তাকিয়ে ছিলো অপরিচিত ঔৎসুক্যে। মুকুলের মনে হলো সে চোখে আলোর ঝলক খেলছে ! বাস্তবিকই কি তার চোখে সেদিন আলো উঠেছিলো ফুটে,—বসন্তের এক ঝলক আলোভরা প্রভাতে ?

মুকুলের বুকে উঠলো দখিনা বাতাসের গুণগুণানি,—কাণে ভাসলো অজানা সুরের ধ্বনি ! সে প্রভাতে তার

জীবনে এলো এক মহা পরিবর্ত্তন,—বসন্ত তার জীবনে পাঠালো তার আহ্বান! এরো আগে তার আরো মেয়েদেরে ভালো লেগেছে, এমনিতরো অভিজ্ঞতা জীবনে তার আর কোনদিন হয়নি! সে ভালোবাসে—আরতিকে সে ভালোবাসে নিশ্চয়ই!

ঘরের ছেলের মতই সে এলো আরতিদের ওখানে,—আর সে যাবেই বা কোথায়? ছেলেবেলার আরতিকে সে ভুলে গেছে—এবারকার আরতি ধরা দিলো তার চোখে রূপের মাঝে প্রিয়া হয়ে! আরতিকে সে ভালোবাসে,—এতো সুন্দর হয়ে তো আর কোন মেয়ে তার মনে ধরা দেয়নি! আরতি যেন তার জন্ম জন্মান্তরের প্রেয়সী, দেশে দেশে, যুগে যুগে তারি জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে আর রূপ পেয়েছে তারি গানের সুরে, কবিতার ছন্দে আর কল্পনার রঙে রঙে .....

সে প্রায় সব সময়ই থাকতো আরতিদের ওখানে। আড্ডা হয়তো ছেলে মেয়েদের সঙ্গে দিতো কিন্তু তার চোখ দু'টি থাকতো আরতির শরীর ঘিরে। সে গল্প করতো আরতির সঙ্গে, বলতো বিচিত্র ভাষায় আর ভঙ্গিতে কতো কিছু তারপর কি বলছে ভুলে গিয়ে থাকতো আরতির মুখে চেয়ে! আরতি কিন্তু তা' ঠিকই বুঝতো। মুকুল হয়তো হঠাৎ বেরিয়ে যেতো দুপুরের রোদে বা রাতের আঁধারে, আবার ফিরেও আসতো যখন খুশি,—সময় অসময়ের কোন খেয়ালই নেই! তাদের বয়সের পার্থক্য সে ভুলে যায়নি,—তবু আরতি কতো সুন্দর!

সে ভালবাসে এই কি যথেষ্ট নয়? সে আরতিকে ভালোবাসে আবেগের আতিশয্যে,—সে মাতাল হয়ে উঠে আরতির চিন্তায়! সে পাগল হয়ে উঠে, সে আরতিকে চায় তার বুকের মাঝে ধরে রাখতে! তার রক্ত স্রোতে ফিরে আরতি ধ্বনির আঘাতে—ফেনিয়ে উঠে উচ্ছ্বসিত ফেনীল সাগরের মতো—

আরতির জীবনেও এবার পরিবর্ত্তনের হয় সুরু আশ্চর্য্য ভাবে। অসংখ্য ধরণের পরিবর্ত্তন তার জীবনে এসেছে বয়সের তালে তালে—তবু এ এক নূতন পরিবর্ত্তন! তার মন নূতন এক চেতনার স্পর্শে জেগে উঠে,—তার ম্লান চোখে আলো উঠে জ্বলে! বসন্ত আজ তার জীবনে নূতন ভাবে পড়ে ধরা। সে বাইশ বছর আগের এক বসন্তের কথা মনে করে লাল হয়ে উঠে তবু তা' তো এমন করে তার চেতনাকে স্পর্শ করেনি জাগায়নি তার রক্তস্রোতে এমন মাতাল উৎসবের আনন্দ? সে জেগে উঠেছে—জেগে উঠেছে তার ভেতরের নারী মুকুলের প্রেমের স্পর্শ পেয়ে! সে মনে মনে জানে একে প্রশ্রয় দেওয়া উচিতও নয় শোভনও নয়,—কিন্তু কি করবে সে?···আজ এ বসন্তে এক তরুণ প্রাণের আবেগ ভরা কামনায় হয় তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা, তারো জীবনে রোমান্স দেয় দেখা। বড়ো দেরি হয়ে গেছে; আরতির আজ পদে পদে বাধে,—তবু সে জেগেছে!

মুকুল ঘণ্টার পর ঘণ্টা আরতির সঙ্গে গল্প করে চলে। আরতি বসে বসে শোনে,—শুনতে শুনতে হয়তো তারো মুখে

খেলে রক্তের ঝলক,—হাসে সে মৃদু। মুকুল বলে দেশ বিদেশের মেয়েদের প্রেমের কাহিনী তার কাব্যের ভাষায়,—চন্দ্রাবতী, মীরা, এনা, এলিজাবেথ, ক্লিওপেট্রা। আগ্রহে আরতি শুনে বসে, চোখে তার জীবন ঝলে উঠে—খেলেযায় বিদ্যুৎ, চেয়ে থাকে সে মুকুলের মুখে। মুকুল হয়তো বলছে হঠাৎ উঠে যায়, না গেলেও আরতি তাকে বাড়ী যেতে বলে। মুকুল বলে,—কেন আরতি, বাড়ী গিয়ে কি করবো—সেখানে যে আমার কিছুই করবার নেই!—

আরতি সে কথাও জানে!

মুকুল বলে,—আমিও যে ভালবাসি আরতি!—

আরতি জিজ্ঞাসা করে,—বলে,—কাকে?—

মুকুল বলে,—তোমাকে আরতি—আমি তোমাকে সত্যি সত্যি ভালবাসি; তোমাকে আমি চাই—তুমি কতো সুন্দর!—

তারপর হয় সে চলে যায় নয় আরতি কোন কাজের ছুতা ধরে সরে পড়ে। এমনি চলে দিনের পর দিন!

মোহন আরতির চোখে চেয়ে দেখে,—চেয়ে দেখে সেখানে আলোর উৎস, জীবনের জোয়ার, নব জাগরণের সুস্পষ্ট আভাস। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাসও বেরিয়ে আসে তার পাঁজর ভেদ করে। একি পরাজয়ের গ্লানিই শুধু—না আর কিছু?

আরতি রোজই মুকুলকে বাধা দিবে ভাবে, কিন্তু অন্তরের গোপন কোঠায় যে কুমারী লভেছে জন্ম নব প্রেরণার আনন্দে

তা' তাকে শাসিয়ে রাখে,—গতির ছন্দে বুদ্ধি-বিবেককে হার মানতে হয়—পদক্ষেপের তালের তলে তার হয় সমাধি। আর সত্যিই তো মুকুলের আসনে সে আজ আর কাকেই বা বসাবে? হয়তো এ তার মৃত্যু,—তবু তার মনে হয়,—এমন করে যদি সে মরে তাতেই বা কি ক্ষতি? মৃত্যুর আনন্দের মাঝে তার নব জীবনের হয় সূচনা!

এমনি করে মরণের আনন্দের মাঝেও কি আমরা বেঁচে থাকিনা? পূর্ণ জীবন কি আমাদের গ'ড়ে উঠেনা মৃত্যুর আহ্বান ধ্বনির মাঝেই, জীবনের মমতায় যখন তা' ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে না—পরিণতি লাভ করে জীবনের আনন্দের মাঝেই?

তবু এ নতুন অনুভূতি বড়ো দেরিতে এসেছে তার জীবনে। কিন্তু সকলের জীবনেই যে একই বয়সে এ অনুভূতি আসবে তারি বা কি বাঁধাধরা নিয়ম আছে। প্রত্যেক জিনিষই তার চারিদিকের অনুকূল আবহাওয়ায়ই কি গড়ে উঠে না? আজ এ অসময়েই যদি আরতি জেগে থাকে তা'তে কি বাধা থাকতে পারে?

সে দিন বিকালের দিকে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আঁধার নামছে যেন ধীরে ধীরে আকাশ হতে ধরণীর বুকে—ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে পৃথিবীর শরীর ঘিরে কালো শাড়ীর পাৎলা আবরণের মতো,--দৃষ্টি তা ভেদ করে শরীরে পৌঁছে। বাতাস ধীরে সন্তর্পণে ফেলছে নিশ্বাস যেন কেউ কান পেতে আছে তা' শোনবার জন্য! ঘরের ভিতরটা আঁধারে ভরে গেছে—ঢুকলে

দৃষ্টি বুঁজে আসে কিছু দেখা যায় না এমনি! ঘরের ভিতর বিছানায় শুয়ে আরতি,—শরীরটা তার ভাল নেই। বাইরের ঘরে চেয়ারে পড়ে মোহন কি ভাবছে কে জানে? ছেলে-মেয়েরা হয়তো বেড়াতে গেছে,—হয়তো খেলছে কোথাও! বাড়ীটা নিঝুম—কারো সাড়া নেই!

মুকুল এলো, আরতির শিয়রে বসে বললো,—শরীরটা আজ ভালো নেই বুঝি!—আরতির চুলে আদরে তার হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো! আরতির মনে লাগছে মত্ত দোলা সে, আদরের স্পর্শে ধীরে ধীরে চোখ বুঁজে আসছে যেন! মুকুল তার মুখে চেয়ে ভাবছে,—কতো সুন্দর! আরতি সে দৃষ্টি অনুভব করছে তার বুকের তলায়। রক্তে তার লাগছে দোলা, —মুকুলের বাঁ হাত সে তার মুঠোর ভিতর অনুভব করছে! মুকুল তার মুখের উপর ঝুকে দেখছে আর ডান হাত বুলিয়ে দিচ্ছে তার চুলে!

মুকুল বলছে,—তুমি কতো সুন্দর আরতি! তোমাকে আমি সত্যি ভালবাসি। চল না আমরা চলে যাই—দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবো অচেনা দৃষ্টির মাঝে—কেবল তুমি আর আমি! সত্যি আমি তোমাকে চাই আরতি,—তোমাকে না পেলে আমার এ জীবন যে একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে—

জীবনে হয়তো দাগ পড়ে, ব্যর্থ হয়েও যায় হয়তো— হয়তো ব্যর্থ তা' হয়ও না! সে কথা আরতি বিশ্বাস করলো

কিনা জানি না, তবে কুমারী নারী যে তার ভিতর থেকে বেরিয়ে ধরা দিলো আর তার মন উঠলো মাতাল হয়ে একথা ঠিক। চোখে তার জ্বলে উঠলো সর্ব্বনাশা আগুন!—

মুগ্ধকণ্ঠে ধীরে ধীরে আরতি বললো যেন আঁধার আঘাত পাবে তার কথার শব্দে,—সত্যি,—ভালোবাস তুমি? যাবো আমি,—যাবো তোমার সঙ্গে যেখানে খুশি- মরণেরো ওপারে!

তারপর আরতি তাকে ডানহাতে জড়িয়ে ধরলো, ওষ্ঠে দিলো আবেগভরা চুম্বন,—দুজন মরলো দেহের সীমায়··· কতক্ষণ কাটলো জানিনা, একসময় মুকুল বেরিয়ে গেলো ধীরে ধীরে,—মুখে তার বিজয়ের হাসি ফুটে উঠলো নাকি?—

আরতি ভাবতে থাকলো,- মুখে তার একঝলক রক্ত, চোখে জীবনের দীপ্তি,—সে জেগেছে, নূতন হয়ে সে বেঁচে উঠেছে,—তার হয়েছে নারী জীবনের পূর্ণ বিকাশ! সে যা' ইচ্ছা করতে পারে ছাড়তে পারে সংসার সমাজ—মুকুলকে নিয়ে ভাসতে পারে সে জীবনের তরঙ্গে তরঙ্গে। কোন বাঁধা আজ আর তার মাঝে নেই—নেই কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব! সে আনন্দে তার মনে হয়,—সে যেন আজ মরতে পারে, বেঁচে থাকবে সে মৃত্যুরো মাঝে—বেঁচে থাকার কি তার এরপরও কোন সার্থকতা আছে? সে খুশি হয়ে উঠে—মৃত্যুর আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে তার মুখ! সত্যি সে রাতে সে করে আত্মহত্যা!······

এমনি করে এ কাহিনী শেষ হয়ে আসে। সে বেঁচে থাকলে হয়তো এ ধরণের হতো না। আরো সুন্দর হতে পারতো কি?

আরতির জীবনহীন মুখের দিকে পরদিন প্রভাতে মুকুল চেয়ে দেখে,—কতো সুন্দর!……

শ্রীহট্ট,
১৯৪১ ইং,
সেপ্টেম্বর।

মীরাদি-

মীরাদির সঙ্গে যখন পরিচয় তখন শ্যামলের বয়স চৌদ্দ; আজ ছাব্বিশ বছর বয়সেও শ্যামলের মনে হয় সেই মীরাদিই যেন একমাত্র তার আত্মীয়, জগতে আত্মীয় বলে সে তাকেই শুধু জেনেছে আর তার কেউই নেই—ছিলোও না! কোনদিনই যে ছিলো সেকথাও সে বিশ্বাস করতে পারেনা অথচ মীরাদির সাথে তার পরিচয় তো মাত্র দেড় বছরের!

দিনের বেলা সে দিব্যি তার কাজকর্ম্ম করে যায় আর দশজনের মত, কিন্তু রাতে সে পাগল হয়ে উঠে! মাথায় তার অসংখ্য চিন্তা জাল বুনতে থাকে, আঁধার তাকে নামধরে ডাকে, জ্যোৎস্নালোকে ভেসে আসে দূর হ'তে কিসের আভাস—বাতাস আনে তার কাণে অতি পরিচিত নিশ্বাসের ধ্বনি! দূরের ওই তারাটা যেন তারি মুখে চেয়ে অপেক্ষায় অপেক্ষায় সারাটা রাত কাটিয়ে ভোরের আলোয় বিদায় নেয়—ও যেন তাকেই চায়—শুধু তাকেই! তার মনে হয় সে যেন এ জগতের নয়—অন্য কোনখানের—অন্য কোন এক জগতের যেখানে তার অস্তিত্বের সঙ্গে গাঁথা হয়ে আছে মীরাদির অস্তিত্ব,—সে আর মীরাদি-তারা দুটি ভাইবোন কেবল!

কবে কোনদিন তার আরম্ভ সে কথা শ্যামল জানে না—এ শুধু তার অনুভূতি,—পুঞ্জে পুঞ্জে লাল বুদ্বুদের রাশি ফেনিয়ে

উঠছে তার ধমনীর মাঝে—যেন ফুটন্ত রক্ত! কবে কোনদিন তার আরম্ভ এই সমস্ত অনুভূতির—সেকথা তার আজ মনে নেই। তবু এই তার জীবন—তার মনের এই অনুভূতির মাঝেই তাকে বেঁচে থাকতে হবে,—এগুলোকে সযত্নে লোক চক্ষুর আড়ালে ঢেকে আর সেই সঙ্গে ঢেকে রেখে নিজেকেও! নিজের মনের দ্বন্দ্বে সে ক্ষত-বিক্ষত, সংসারের নয়,—কিন্তু একথা বললে নিজেকে কি সংসার থেকে বাদ দেওয়া হয়না? তবু সে জানে,—সে সংসারের নয়,—সংসারছাড়া!

সংসারছাড়া সত্য, কিন্তু কেমন করে হলো তারো একটা ইতিহাস আছে। পাগলামি তার মনের ভিতর সীমা ছাড়িয়ে গেলেও বাইরে তার প্রকাশ কতটুকুই বা! সবাই তাকে বুদ্ধিমান বলে, প্রশংসাও করে,—সে মনে মনে হাসে। সে জানে,—এই অনুভূতিই তার জীবন—সেটা পাগলামিও নয়, হাস্যকরও নয়; তবু লোকে তাই বলে থাকে,—তারা বুদ্ধিমান আর তাদের বুদ্ধির তারিফ রাস্তায় ঘাটে সব জায়গায়ই শোনা যায়—কাজেই তা' স্বীকার্য্য।

যা' হোক তখন তার বয়স আট নয়ের বেশী নয়; সে যখন মহাভারত পড়তো ভাবতো সে ভীমের মতো বীর কিংবা অভিমন্যুর মতো, আর অর্জ্জুনের দিকে তার পক্ষপাতিত্ব ছিল বরাবরই—যেমন রামায়ণে রামের প্রতি, কিন্তু রাবণ আর ইন্দ্রজিৎই তাকে টানতো, আর সীতা আর দ্রৌপদী তো রাস্তায় ঘাটে হাজার হাজারই ফলে আছে।

তারপর যখন তার বয়স দশ তখন সে তার বিশ্বাসে আঘাত পেলে প্রথম। দেখলো অভিমন্যুর যদিবা বিদ্যেটা আয়ত্তে ছিলো তার সেটা মোটেই নেই। দাদা যখন তাকে শাসন করলেন সে জোর করলো অবশ্য—হাতপাও ছুড়লো—তবু অতি সহজেই কাবু হয়ে পড়লো।

বারো বছর বয়সে অনেক কিছুই সে হয়েছে—বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, প্রতাপ আরো কতো কি! কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনটাই টিকলো না। লেখাপড়ায় একেবারে সে খারাপ ছিলো না—যখন রাজনীতিতে এলো ভাবলো দেশ নায়ক হয়ে গেলো বুঝিবা—কিন্তু সে ভুলও তার ভাঙতে দেরি হলোনা!

বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ তার বিশেষ কিছুই নেই! মাকে তার মনে পড়েনা আর বাবা মারা যাওয়ার পর দাদাদের তরফ থেকে তার বিষয়ে বিশেষ কোন কৌতূহলের আভাসও পাওয়া যায়নি! সেও তাদের থেকে সরে থাকতেই চায়—তা'দের সঙ্গে যোগ তার কতটুকুই বা—সংসারকে দেখতে তো আর তার বাকি নেই!

চৌদ্দ বছর বয়সে মীরাদির সঙ্গে তার পরিচয় আর পরের দেড় বছরে তার জীবনে দ্রুত পরিবর্ত্তন হয়েছে। ষোল বছর বয়সে সে তার ধর্ম্মজীবন, কর্ম্মজীবন শেষ করে ফেলেছে। তার ইচ্ছা ছিলো বড়ো ব্যবসায়ী হয় কিন্তু পুঁজির একান্ত অভাব—আর তা' থাকলেও ব্যবসায়ে সে ঠকতোই— টিকে থাকতোনা! ষোল বছর বয়সে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে সে এক মাড়োয়ারীর

দোকানে তিরিশ টাকা বেতনে ইংরাজী সরবরাহ বিভাগে ঢুকে পড়লো আর তাতেই টিকে আছে ছাব্বিশ বছর অবধি। সম্মান বাড়লেও মাইনের দিকে কিছুই বাড়েনি আর তাতে তার আপত্তিও বিশেষ নেই। তার প্রয়োজনও তেমন বিশেষ কিছু নয়, আর কাজের দিকেও বিশেষ যে কিছু আছে তেমনও নয়; তা' ছাড়া ফাঁকি দেবার বিদ্যেটাও তার সম্পূর্ণ আয়ত্তে এসে গেছে।

মীরাদি তার চেয়ে বছর দশেক বড়ো; প্রিয়বাবুর স্ত্রী সে!

প্রিয়বাবুকে সে বরাবর প্রিয়দা বলে ডেকে আসছে—সম্মানও দেয় বড়ো ভাইএর! ভারি অদ্ভুত - একটুকরা হাসি লেগেই আছে! কথা কম বলেন আর নিজের বিষয় তাকে কোন কিছুই বলতে শোনা যায়নি!—প্রিয়দার হাসিকে মনে হয় ঠিক যেন সাহারার বুকে নদীর স্বচ্ছধারা কিন্তু এ কেমন করে হয়? —শ্যামল ভাবে।

রাজনীতি ছাড়লো সে একটু কথা কাটাকাটি করে তার মতের অমিলের আছিলায়— আসলে তার আর ভালো লাগছেনা এসব! কিন্তু কেন সে খবর কেউই নিলেনা,—স্বদেশী মহলে তার বিষয় অনেক আলাপআলোচনা হলো—মুখটিপে হাসতেও সে দেখলো। গায়ে জ্বালা করতে থাকলেও সে কিছুই বললো না, মন তার ওদের উপর বিতৃষ্ণায় ভরে গেলো শুধু! ফলে সে দিলো স্পষ্ট অবজ্ঞা আর তার গায়ের জ্বালাও জুড়ালো না!

বাসায় এসে সে প্রিয় বাবুকে বললো,—ওসব স্বদেশী ছেড়ে দিলুম প্রিয়দা যতো সব ধড়িবাজ—আমার আর পোষালো না—অতি সহজে যেন তেমন একটা কিছু ঘটেনি !

ওরা যে ধাড়িবাজ সেটা প্রিয়বাবু বিশ্বাস করলেন কিনা বলা শক্ত তবে শ্যামলের যে পোষাবে না এ যেন তিনি জানতেন—এমনি ভাবেই হাসলেন, বললেন না কিছুই !

তাতে সে না দমে বললো,—তা একটা কিছু করে নেবই দেখবেন—প্রিয়দা—

প্রিয় বাবু সেটা বিশ্বাস করলেন নিশ্চয়ই কিন্তু কোন কিছুতেই সে টিকে থাকবে এ ভরসা তার মোটেই ছিল না।

তবু তাকে একেবারে আশ্চর্য্য করে দিয়ে সে দশ বছর ধরে একটা কাজেই টিকে রইলো,—এ যেন আর বিশ্বাস হয় না। প্রিয়বাবু ভাবলেন—ওরা সবই পারে—শ্যামলের মুখের দিয়ে চেয়ে তার দীর্ঘশ্বাসও পড়লো না কি ?

মীরাদির সঙ্গে তার দেড় বছরের পরিচয় তবু সেই দেড় বছরের পরিচয়ই তার সমস্ত জীবনের অনুভূতির মাঝে মিশে রইলো ! মীরাদি যেন মানুষ ছিলেন না—তিনি ছিলেন তার বোনই শুধু !

প্রিয়বাবুর সঙ্গে পরিচয় তার চাঁদার খাতায় ! আদায় করতে এলো সে—বয়স চৌদ্দ, পড়াশুনায় ভালো দেখতেও চমৎকার সরল চেহারা।

প্রিয়বাবু তার পরিচয় চাইলেন--বললেন,—তুমি কোথায় থাকো--

শ্যামল পরিচয় দিয়ে বললো,—এইতো বোর্ডিংএ! স্কুল কর্তৃপক্ষ সতর্ক করে দিয়েছেন যদি সে নির্দ্দিষ্ট জন কত লোকের সঙ্গে মেলামেশা করে তা' হলে তাকে তাড়িয়ে দেবেন।—তা' দিলেইবা, ভারিতো ওরা ভয় দেখাচ্ছে,—সে বললে!

প্রিয়বাবু বললেন,—তবু তুমি মিশবে—যদি তাড়িয়ে দেয়?

শ্যামল উত্তর দিলো,—দিলেই বা, কি আর হবে তাতে— চলে যাবো!

—তোমার বাবা কিছু বলবেন না?—

—বাবা? তিনি তো নেই; আর কেউই কিছু বলবেন না, খরচ তো আর দিচ্ছেন না কেউ?—

—তা' যাবে কোথায়?—প্রিয় বাবু জিজ্ঞাসা করলেন। ওটা যেন ভাববারই নয় এমন ভাবে সে উত্তর দেয়,— —কেন? ধরুন আপনার ওখানেই চলে আসবো—

প্রিয়বাবুর ছেলেটিকে ভালো লেগে যায়—বলেন,—তা' এক কাজ কর, তাড়িয়ে দেবার আগেই তুমি চলে এসো— কালই!

মীরা বলে,—তোমার নাম কি?

শ্যামলের মুখ লাল হয়ে আসে, বলে,—শ্যামল—

—বাঃ বেশ নাম তো আমাকে কি বলে ডাকবে?—মীরা জিজ্ঞাসা করে।

শ্যামল একটু ভেবে উত্তর দেয়,—দিদি—

মীরা বলে,—তাই ডেকো, মীরাদি,—বুঝলে !—

মীরা তার মাথায় হাত রাখে, ওখানেই হয় তাদের সম্পর্কের পত্তন যা' আজো শ্যামলের সারাটা অস্তিত্ব আর অনুভূতি জুড়ে সৃষ্টির এক বিরাট রহস্যের মতো বিরাজ করছে ! যা' সে ভাবে পাগল হয়ে,—কিন্তু ঠিক ঠিক বুঝে উঠতে পারেনা—অনুভব করে থাকে ! আজো সে বুঝে উঠতে পারে না মীরাদি কেন তাকে এমন করে ডাকতেন, এ তো শুধু স্নেহ-শীতল নয়—কতো করুণ শুনাতো সে ডাক, যেন বিশ্বের জমাট বাঁধা অশ্রু নিঙড়ে ঝরে পড়তো তার সে কণ্ঠস্বরে—তবু তা' তার কতো ভালো লাগতো !

সে চলে এলো। প্রিয়বাবুর ছেলে-মেয়ে হয়নি, বিয়ের ছ' সাত বছর কেটে গেছে।

তারপর থেকে সে সেখানেই আছে। নিজের খেয়ালে যা' খুশি করে গেছে কেউই কিছু বলেনি ! মীরাদি তা'কে ঠিক ছোট ভাইএর মতো স্নেহ করে—আর সে যে কি শ্যামল বুঝাতে পারবে না কিছুতেই,—এতো স্নেহ,—যদিও সে সেটা চায়নি তবু তার মাঝে মাঝে মনে হয় মীরাদি আছে তাই যেন সে বেঁচে আছে,—নইলে সে কবে মরে যেতো—বাঁচতোনা বুঝিবা !

—মীরাদি ভারি অদ্ভুত মেয়ে !—তার মনে হয়,—এমনটি সে কোনদিন দেখেনি—কাব্যে পুরাণেও না,—আর সংসারে তো দুর্লভই !

সেদিন সে যখন বলেছিলো,—অনেক দেখলাম মীরাদি, আর তাই সংসারে আমার বিরাগ এসে গেছে, সত্যি এবার সন্ন্যাসী হবার মৎলব এঁটেছি। কালই দিচ্ছি হরিদ্বারের দিকে পাড়ি! আর সংসার নয়, সংসারের বাইরেটাই দেখি এবার।

মীরার চোখে ফুটে উঠে একটুকরা আশঙ্কা। শ্যামলকে সে হারাতে পারে না তো—বিশ্বের বুকে হারিয়ে যাওয়া তাকে যে সে খুঁজে পেয়েছে—সে যে তারি!

মীরা বললো,—কি আর দেখলে ভাই,—মোটে তো পনেরো মাত্র বয়স! এখনো অনেক—অনেক বাকি রইলো যে—সংসার ছেড়ে গেলে কিন্তু তা' আর দেখাই হবে না!

সে বললো,—সত্যি বলছো—তা হলে এই রইলাম, সন্ন্যাসী আর আমি হচ্ছি না; আমি তো সংসারের বাইরে থেকে সংসারকেই দেখতে চাই। সংসারটা যে ভারি নোংরা আর লোকগুলো সব জুচ্চোর আর ধড়িবাজ—তার উপর মাথায় যে ওদের মগজ মোটেই নেই ওই তো কষ্ট!—

মীরা বুঝে সে আঘাত পেয়ে গেছে মানুষের উপর চটে,—কিন্তু সংসারে থেকে এ আঘাত এড়িয়ে চলবারও তো উপায় নেই?

—তা' হয়না ভাই,—সন্ন্যাসী সেজে সংসার যে দেখা হয়না তা' ঠিক! জুচ্চোর আর ধড়িবাজ হলেও এ যে আমাদেরই সংসার—তোমার, আমার, মানুষের! মানুষকেই যদি ছেড়ে

গেলে তো আর দেখলে কি? বাইরে থেকে উপদেশই দেওয়া চলে—দেখা চলেনা,—আর সে উপদেশও মানুষের বাইরে থেকেই যদি আসে তা' হলে তাই বা মানুষের কি কাজে লাগতে পারে বলো,—মীরা বললে।—

সে বললো খুশি হয়ে,—তা' ঠিক মীরাদি, অতশত কোনদিন ভেবে দেখিনি তো!—কি যে সে বুঝলো সে-ই জানে—হয়তো কিছুই না, আর সত্যি সব কিছু না বুঝলেও দিব্যি চলে যায়—যতোটুকু ইঙ্গিতে ধরা পড়ে তাই হয়তো ঢের! ভাবলো,—মীরাদি কতো জানে—মীরাদি একেবারে অদ্ভুত! আপাততঃ তার সন্ন্যাসটা মুলতুবিই রইলো!

মীরা বললো,—ভাবতে শিখ ভাই, যা'রা ভাবতে জানে তারাই তো সত্যিকার মানুষ!

সে অবাক হয়ে বললো,—সেও কি শিখতে হয়—সবাই তো ভাবে!

মীরা বললো,—না রে, সবাই ভাবে না,—ভাবতে জানেও না,—সেটাও শিখে নিতে হয় বইকি!—

সে কি বুঝলো কে জানে—আর কিছু বললো না!

সে ভাবে ওই মীরাদিই যেন জন্ম জন্ম ধরে তার দিদি হয়ে জন্মাচ্ছেন আর তারা এক হয়ে আছে সংসারের দু'পারে দু'জন থাকলেও। সে অনেক কিছু হ'তে পারতো কিন্তু না পারার জন্য দায়ী মীরাদিই! মীরাদিই তার আর কিছু হওয়ার পথে

বাধা ! মীরাদি আছেন কাজেই তাকে নিরীহ ভাই হওয়া ছাড়া আর উপায় কি ? আর আজো কি ঠিক তাই নেই ?

এজন্য একদিন সে মীরাদিকে দু'কথা শুনিয়েও দিয়েছে ; বলেছে,—

—মীরাদি, তোমার জন্যি তো আমার কিছু হ'লো না—কোন উন্নতিই !—একটু অভিমান যেন ঝরে পড়লো,—ঝাঁঝও কথায় কম নেই ।

মীরা তাতে কৌতুক বোধ করলো—বললো.—কেনরে, কি হলো আবার ? তুই নিজে কিছু করতে পারলিনে আর দোষী হলাম আমি ?—মুখ তার প্রচ্ছন্ন হাসিতে ভরে উঠলো !

—তাই বুঝি ! তুমিই তো চাও আমি নিরীহ ছোট ভাইটি হয়েই থাকি—নইলে—

—ও, সন্ন্যাসী হতে দিইনি তাই রাগ হয়েছে—মীরার চোখ দুটি ম্লান হয়ে এলো ।—তা' না হয় তুই আমার ছোট ভাই হয়েই রইলি শ্যামল, কাজ কি তোর উন্নতিতে ? আমরা ভাই-বোন দিব্যি থাকবো একত্রে একেবারে আমার মরবার দিন অবধি এই কি যথেষ্ট নয় ভাই ? দেখিস্ শ্যামল, আমাকে ফেলে কোথাও যাসনে ভাই,—তা' হলে কিন্তু খুব কাঁদবো আমি,—তার শেষের কথা কয়টি কান্নার মতোই শুনালো নাকি ?—কিন্তু এ কান্নার উৎস কোথায়, কি তার কষ্ট—শ্যামল ভেবে পায় না ।

উঃ মীরাদি কি ভয়ানক,—শ্যামলের চোখ একেবারে জলে ভরে এলো, তার উপর এক ঝলক হাসি টেনে সে বললো'—তাই

আমি বলছি নাকি ? তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না দেখে নিয়ো দিদি—অমনি বললাম আমি আর তুমি তাই সত্যি ভেবে নিলে—তুমি একেবারে কিছু বোঝনা দিদি! তোমাকে ছেড়ে কি আমি থাকতে পারবো কোথাও ?—স্বরটা তারো ভারি।

সত্যিতই তো সে মীরাদির ভাই হয়েই যদি থাকে তবে তাই কি কম হলো ? মীরাদির ছোট ভাই হওয়া কি যে সে কথা ? সত্যিকার গর্ব্ব সে অনুভব করলো,—বললো, অমনি আমরা জন্ম জন্ম, যুগ যুগ ধরে ভাই বোন হয়ে আছি—তাই না দিদি ?—যেখানেই থাকিনা কেন আমরা একত্র হবোই!—

মীরা শুধু হাসলো! মনে মনে বললো,—তাই হবে, নইলে তোকে আমি পেলুম কি করে ভাই—

মীরাদি যখন শ্যামল বলে ডাকেন কত করুণ শোনায়—তার মন একেবারে ভিজে আসে যেন! তার মনে হয় এ যেন মীরাদির ডাক নয়,—এ ডাক যেন ভেসে আস্‌ছে বিশ্বের প্রাণনাড়ী থেকে চোখের জলে ভিজে—আর তা বাতাসে সারাটা পৃথিবীর বুকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে প্রত্যেকটা প্রাণীর বেদনা আর কান্নার মাঝে গোপনে—অথচ কোথা হতে যে এ কান্নার সুর মানুষের বুকে উঠছে তা মোটেই মানুষ জানে না। তবু কেন মীরাদির ডাক এতো করুণ শোনাবে যা তাকে একেবারে অস্থির করে তুলে। মনে মনে সে কতদিন ভেবেছে মীরাদিকে

একদিন এমন করে না ডাকতে বলে দিবে সে; কিন্তু তা সে পারে নি! অস্থির তাকে করলেও এ ডাক যে তার খুবই ভালো লাগে সে কথা তো সে মনে মনে জানে! এযে তার মীরাদির ডাক,– ভালো না লেগে কি পারে?

তবু সে মাঝে মাঝে ভাবে,—মীরাদি কি? কোথা হতে এলেন তিনি? সত্যি কি তিনি মানুষ? মানুষ কি ওরকমের হতে পারে,—এতো স্নেহ—এতো সুন্দর হতে মানুষকে তো সে দেখেনি? মানুষের মাঝে মীরাদি আছেন তাই আজো সে মানুষকে গ্রাহ্য করে—নইলে মানুষের রূপ তো কিছু আর তার দেখতে বাকি নেই! মীরাদি যে তারি বোন—এরকম না হয়ে কি পারেন?

সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসে,—সে মীরাদিকে ছেড়ে কোথাও যাবে না—কক্ষনো না! মীরাদিকে সে ছেড়ে দিবেনা কোনদিনই!

তার কিছু দিন পরের কথা। সে কথা আজো তার চোখে জীবন্ত হয়ে ভেসে আছে—সেকি আর ভুলবার? মীরাদিকে সে ধরে রাখতে পারে না,—তাদের মাঝে বিচ্ছেদ আসে চোখের জলে ভিজে—যে চোখের জল পুঞ্জীভূত হয়েছিলো মীরাদির শ্যামল ডাকে!

—মীরাদির অসুখ হলো—সে আগাগোড়া বসে রইলো তার শিয়রে স্নানাহার ভুলে গিয়ে। প্রথম তার জ্ঞান ছিল

না কিন্তু শেষের দিকে জ্ঞান ফিরে এলো। মুখের উপর দুটো উন্মুখ চোখের দৃষ্টি অনুভব করে মুখ তার মৃদু হাসিতে ভরে উঠেছে! বলেছেন,—শ্যামল, আমায় ছেড়ে কোথাও যাস্‌নে ভাই!—তার চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে। একদিন আবার তার জ্ঞান লোপ পেল আর তা ফিরে এলোনা। শ্যামলের স্পষ্ট মনে পড়ে,—মরবার সময় তিনি যেন কাকে খুঁজছিলেন,—শ্যামল জোরে তার ডান হাত ধরলো—বুক একটু তার উঠলো কেঁপে! মীরাদির মুখ একটু নড়লো,—যেন তিনি বললেন,-শ্যামল আমাকে ছেড়ে কোথাও যাসনে ভাই! সে চীৎকার করে বলে উঠলো,—এই যে দিদি, কোথাও যাইনি তো—আমি কি যেতে পারি—আমি যে তোমারি ভাই—দিদি—দিদি—তার পর স্তব্ধ হয়ে সে বসে রইলো!

দু'দিন সে তার ঘরের দরজা বন্ধ করে রইলো,—কাঁদলো না সে একটুও! মাথার ভিতর তার আগুন জ্বলছে যেন—মনে জ্বালা;— সংসারের বিরুদ্ধে—ঈশ্বরের বিরুদ্ধে—সবকিছুর বিরুদ্ধে! চোখে জ্বল্‌ছে তার হিংসার আগুন—ক্রুদ্ধ আক্রোশে সে জ্বলছে—মেটাতে পারলেই সে বাঁচে!

কেউ তাকে ঘাটাতে সাহস করেনি। তার পর প্রিয়বাবু যখন তার ঘরে এলেন, সে তার দিকে তাকালোও না—জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো। প্রিয়বাবু এসে তার কাঁধে হাত রাখলেন। সে ফিরে দাঁড়ালো তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে,

কিন্তু এ কি! প্রিয়দার এ কি চেহারা হয়েছে—আর চোখ দুটি ?—

প্রিয়বাবু ডাকলেন, যেন কতো দূর হতে,—শ্যামল,—ভাই—

শ্যামল সহ্য করতে পারলো না এ ডাক!—প্রিয়দা,—বলে সে ঝাপিয়ে পড়লো তার বুকে—কেঁদে উঠলো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে—একেবারে ভেঙে পড়লো যেন! দু'জনে খুব কাঁদলেন—দু'জনেরই যে এক বেদনা!

শ্যামল স্বদেশী ছাড়লো—সব কিছু ছাড়লো—ছাড়লো না শুধু প্রিয়দাকে আর এ বাড়ীকে—সে ওখানেই থাকবে ঠিক মরবার দিন অবধি! ওখানে যে মীরাদি আছেন মিশে! সে মাড়োয়ারীর ওখানে চাকরি নিলো আর প্রিয়দাকে আশ্চর্য্য করে তা'তে টিকেও রইলো!

জন্মান্তর, আত্মা, সব কিছু আজ সে মানে।—নইলে মীরাদি কি হারিয়ে যেতেন না আর মীরাদি কি হারাতে পারেন ?—

তার মনে হয়,—আঁধার রাতে তারায় তারায় মীরাদি যেন ফিরছেন আর ইসারায় তাকে ডাকছেন! দাওয়ায় বসে সে রাতের আঁধারে মীরাদিকে ছুটতে দেখেছে। সে যখন ঘুমিয়ে থাকে মীরাদি যেন তার দিকে তাকিয়ে থাকেন আঁধারের পার হতে, আর সে দৃষ্টি সে ঘুমের মাঝেও অনুভব করে থাকে! তার মীরাদি যে এখানে রয়েছেন—তাকে ছেড়ে কি সে যেতে পারে ?

রাতে সে ঘুম হতে কতোদিন শুনেছে যেন মীরাদি তাকে বলছেন,—আঁধারের ওপার থেকে—সংসারের ওপার থেকে,—শ্যামল, আমায় ছেড়ে কোথাও যাসনে ভাই—

অমনি সে চিৎকার করে বলেছে,—না দিদি, আমিকি কোথাও যেতে পারি—আমি যে তোমার ভাই,—দিদি—দিদি—

তারপর চোখ চেয়ে দেখেছে প্রিয়দা তার মুখে চেয়ে আছেন!

শ্রীহট্ট
১৯ শে অক্টোবর, ১৯৪১ইং।

ছন্দা

ছন্দাকে নিয়েই আমাদের গল্প—

মেয়ের নাম ছন্দা—ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটি !

সে হাসে কাঁদে ঠিক ছোট্ট মেয়ের মতো, বড়ো বড়ো চোখ আকাশে তাকিয়ে থাকে,—জগতের কিছুই হয়তো বুঝে না। সবাই আদর যত্ন করে—বলে,—খাসা মেয়ে !

ছন্দা দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠে, লেখাপড়া শিখে—ভাবে আমি কি আর সত্যি ছোট ছিলাম, যেন এতো বড়োটি হয়েইও জন্মেছে,-জীবনের আনন্দে ছুটে চলে—চারদিকে তাকিয়ে দেখবার ও যে প্রয়োজন আছে তা মনে থাকে না। এমনি চলতে পারলে মন্দ ছিলো কি ?—তা হয়তো ছিল না। কিন্তু অমনি চলা যায় না—সংসারের দিকে তাকিয়ে দেখতে হয়।

সব কিছুরই একটা সময় আছে ; আমরা সেটাকে অস্বীকার করি বলেই তা আমাদের পথ ছেড়ে দেয় না। ছন্দার বয়স যখন পনেরো তার বাবা মারা গেলেন, সংসারে রইল ছন্দা আর তার মা। বাবার সঙ্গে সংসারের আনন্দও নিমেষে উবে গেল। এমন কিছু বড়লোক ছিলেন না ছন্দার বাবা।

কঠোর বাস্তবের সামনা সামনি দাঁড়িয়ে মা ও মেয়ে দেখলেন সংসারের পথে তাদের পাথেয় বিশেষ কিছুই নেই! চলতে হলে সব কিছু বজায় রেখেই চলতে হয় না হয় সংসারের পথ আগলে দাঁড়িয়ে থেকে বিশেষ লাভ কিছুই নেই।

জীবনের আনন্দে চলতে আরাম আছে, কিন্তু জীবনটা যে নেহাৎ আনন্দ দিয়েই গড়া নয় দায়ে পড়ে ছন্দাকেও ত মানতে হয়। অনুরু মন কিন্তু অবুজ হয়েই থাকে স্বচ্ছন্দ চিত্তে তা মেনে নিতে পারে না,—সত্যকে সত্য বলে গ্রহণ করতে বাধে। ফলে চারদিক ঢেকে চলতে হয়,—মনে ধরা পড়বার ভয় ও থাকে।

ছন্দার কিন্তু তবু জীবনের তাল কেটে গেল না, শুধু তার মা অন্নদা জীবনের ছন্দের সঙ্গে সংগতি রেখে আর চলতে পারলেন না। যেমনভাবে তিনি চলতে আরম্ভ করলেন তার সঙ্গে কিন্তু তার আগের জীবনের কোন মিলই নেই। ছন্দা আশ্চর্য্য হয়ে দেখলো মা পূজা আর্চ্চা আর নিজের শুচিতা নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু এক টুকরা পাথরের ভিতর কি থাকতে পারে তা নিয়ে ছন্দা যখন ভেবে ভেবে কিছুই আবিষ্কার করতে পারলো না সে হাল ছেড়ে দিলো—ভাবলো—দূর ছাই, মিছে ওসব ভেবে কি হবে,—মানুষের মনের গতি বুঝা দায়—যুক্তিতর্কের ধার ঘেসেও তা চলে না।

সংসারকে ফাঁকি দিতে চাইলেই সব সময় তা দেওয়া যায় না — অন্নদাকেও সংসারে ফিরে আসতে হয়। খাওয়া পরা রয়েছে, তাছাড়া মেয়ের কথাও তাকে ভাবতে হয়……

মা বলেন,—একটু বুঝে চলিস্ ছন্দা, পুরুষের রুচিজ্ঞানের মাত্রাটা একটু বেখাপ্পা কি না।—মনে মনে ভাবেন ;—দীপুর সঙ্গে ওর বিয়েটা হলে খাসা মানাতো আর কর্ত্তা বেঁচে থাকলে সেটা ভাবতেও হতো না,—দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

ছন্দা মার দিকে চেয়ে ঘাড় হেলিয়ে হাসে অর্থপূর্ণ হাসি, মাকে বুঝিয়ে দেয় যেন সেটা তারো জানতে কিছু বাকি নেই।

দীপুর সঙ্গে ছন্দার পরিচয় ছেলেবেলায়। ওরা ধনী, বড়লোক। তা'দের দু' পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্টতা ছিলো।

মেয়ে কিন্তু তাকে ভাববার অবসর না দিয়েই নিজের খেয়ালে চলতে সুরু করে। সে আর ছোটটি নেই, তার আজ বয়স হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, কোন জিনিষ যে কি সে আজ ভালই বুঝে! চাকরি একটা সে করে নেবেই,—মাষ্টারি একটা দেখে নিলেই হবে। মেয়েদের চাকরি মানেই মাষ্টারি আর ও জিনিষটার চাহিদাও আছে আজো যোগানের চেয়ে অনেক বেশি! আপাততঃ ছন্দা ওখানেই তার চিন্তার রাশ টানে।

ছন্দার মনে পড়ে, দীপু যখন ছোট ছিলো বাড়ীর ওই কালো বিড়ালটাকে তার ছিলো ভয়। দীপু তার চেয়ে বছর দু'য়ের বড়ো হলেও তাকেই বড়ো দেখাতো। দীপু বিড়ালটাকে দেখলেই ভয় পেয়ে তার লম্বালম্বা হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতো। হাত দু'খানা ছিলো কি নরম আর সে যখন ধরতো তখন তা' তার শরীরের মাঝে মিশে লেপ্‌টে থাকতো যেন,—

তার খুব ভালো লাগতো! আজো সে তা' মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে—দীপুর সে শরীরের স্পর্শ যেন আলিঙ্গনের রূপে তা'র চেতনায় ধরা পড়েছিলো সেদিন—উঃ, পাগল করে তাকে সে অনুভূতি—সে অবাক হয়ে ভাবে,—সেই আট বছর বয়সেই কি সে এতো বড়োটি ছিলনা? তবু বয়সই সব কিছু নিয়ে আসে,—সত্যি সেদিন তো সে কই এ কথা ভাবেনি? তার পর হঠাৎ একদিন দীপু বড়ো হয়ে গেলো,—তাকে কতো সুন্দর দেখাতো তখন। ছন্দা বিশ্বাস করে দীপুর সঙ্গে তার ভাব ছিলো সত্যি কিন্তু ভালবাসা ছিলোনা মোটে।

তার বাবা মারা যাওয়ার কিছুদিন আগের কথা ছন্দার মনে পড়ে। দীপু তার দিকে গভীর মনোযোগের সহিত চেয়ে দেখছে, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার কালো বড়ো বড়ো চোখ দু'টি। দীপুর চোখ দু'টি ছিলো যেন ঠিক রাক্ষুসে—দেখলে ভয়ও হতো আনন্দও হতো—কিন্তু কি সুন্দর ছিলো সে চোখ দুটো! ছন্দা তাকে জিজ্ঞাসা করলো—কি দেখছো এমন করে চেয়ে,—সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপর তা'র শ্রদ্ধাও এলো—মনে মনে সে খুশিও হলো—

দীপু উত্তর দিলো,—তোমাকে দেখছি, ছন্দা—

ছন্দা বললো,--আমার মাঝে এমন কি আবিষ্কার করলে বলতো!—

দীপু উত্তর দিলো,—বেশ তো—আরসিতে দেখ না, আমি কি দেখলাম তা' বলবো কেন?—সে তো আমার নিজের!

দীপু চলে গেলে সে আরসিতে নিজের আগাগোড়া চেহারায় কি দেখলো সেই জানে, তবে দীপু যা' দেখেছে, তা' না হওয়াই সম্ভব,—কিন্তু তার মুখখানা টকটকে লাল হয়ে উঠলো। তখন দীপু থাকলে নিশ্চয়ই চিৎকার করে বলে উঠতো,— চমৎকার!

আরেকদিন দীপু চেয়ে দেখছিলো এক বুড়ো ভিখিরীকে। কি বিশ্রী চেহারা লোকটার—যেন ঠিক ডুষমণের মতো—হাতে লাঠি, মোটা মোটা হাড়গুলো হা করে বেরিয়ে আছে! তার সে দেখবার ভঙ্গি ছিলো কেমন এক ধরণের যা' ছন্দা ঠিক বুঝতো না। ছন্দা জিজ্ঞাসা করলো,—ওই ভিখিরীটার দিকে চেয়ে কি ভাবছো—

দীপু বললো,—ভাবছি না তো—দেখছি—

ছন্দা বললো,—একটা ভিখিরী,—ওর মাঝে অতো করে দেখবার কি আছে—

দীপু উত্তর দিলো,—যদি বলি ওই ভিখিরীটার মাঝে সমস্ত মানুষ জাতটা লুকিয়ে আছে—সবাই,—ওই একজনকেই যদি দেখতে পারি তা' হলেই আমার পৃথিবীর যে যেখানে আছে তা'কে দেখা হবে,—সেটা তুমি বিশ্বাস করবে?

ছন্দা বললো—না তো—ও তো একজন মাত্র, তার মাঝে পৃথিবীর সবাই এলো কেমন করে? আমি তো শুধু দেখছি,—একটা ভিখিরী ভিক্ষা করে ফিরছে—

দীপু বললো,—বাইরে থেকে তাই দেখা হয় কিন্তু দেখাটা

তো শুধু চোখ দিয়েই হয় না – আমরা মন দিয়েও দেখি। না হলে যে মোটে দেখাই হয় না –

ছন্দা বললো,—বারে, মন দিয়েও বুঝি আবার দেখা যায় ?

দীপু বললো,—মনে করো আমিই ওর বয়সে ঠিক ওরকম হয়ে গেছি আর ও আমার বয়সে ঠিক আমার মতো ছিলো, কিংবা আমি তার জায়গায় আর সে ঠিক আমি সেখানে—

ছন্দা বললো,—তা'ও নাকি হয় আবার,—বলেই জোরে হেসে উঠলো।

দীপুও হাসলো, কিছুই বললো না।

ছন্দার কাছে আজো সেই হাসি অদ্ভুত ঠেকে যেমন তার কথাগুলো আর চেয়ে দেখার ধরণ।

তার পর ছন্দার বাবা মারা যাওয়ার আগেই সে চলে গেল পশ্চিমের এক সহরে পড়তে। দীপুর সঙ্গে এখানেই তাদের ছাড়াছাড়ি! দীপু যখন যায় তখন তার বয়স ষোল সতেরো হবে,—ছন্দা স্কুলে পড়ে।

ছন্দার মনটা একটু খারাপ হয়েছিলো সত্যি তবে সেটা নেহাৎ পরিচয়ের ঘনিষ্টতাই হবে। বন্ধু বান্ধব যদি বিদেশে যায় তো মনটা কি একটু কি রকম করেনা,—হয়তো চোখও ভিজে উঠে! তবে সেটাকে বড়ো করে দেখবার মতো কিই বা আছে ?

তারপর দীপুকে সে ভুলে গেছে, তার কথা আজ আর ছন্দার মনেও পড়ে না। তার মনে হয় এ যেন হাজার হাজার

বছর আগের কথা—কবে কোন পুরানো যুগে তা শেষ হয়ে গেছে।·····

নীহারের সঙ্গে তার পরিচয় হয়, তারপর বিয়েও হয়ে যায়। সেটাতে অবশ্য তার বাহাদুরী আছে আর বাকিটা তার শিক্ষা, সৌন্দর্য্য আর কিছুটা কপালের জোরেই হয়েছে বই কি! মাকেও কিন্তু এখানে মেয়ের রুচির তারিফ করতে হয়। নীহার ধনী—লেখাপড়াও জানে। আপাততঃ বাড়ী গাড়ী কিছুরই অভাব নেই। ছন্দা ভাবে সমাজের দাবায় সে খুব জিতেছে—

নীহার মানুষ হিসাবে খুব খারাপ নয়, আর তলিয়ে দেখলে সব মানুষই এক। ভালো খারাপ, সহজ কুটিল এসব মানুষের বাহিরের খোলস মাত্র—নিজের হাতে গড়া। প্রকৃতির উপর বাটপাড়ি করতে গিয়ে মানুষ ওই সাজে—নিজেকে খেয়ালের উপর অনিচ্ছাতে আর নিজের অজান্তেও ওই করে গড়ে তুলে। ওই হয় তার স্বভাব। কিন্তু আদতে স্বভাব জিনিষটা মানুষের মৌলিক বৃত্তির উপর এক পোছ রঙ ফলানো মাত্র, এর বেশী কিছু নয়। যা' চাপা পড়ে যায় সেখানে প্রভেদের মাত্রা খুব বেশী কিছু নেই।

নীহার ধনী, তায় লেখাপড়া জানা। চাকরি করে না পায়না বলে নয়—ইচ্ছা নেই বলে, তবে চালচলনে পুরো সাহেবই সে। সব কিছুতে আসন আর আদর তুইই সমান ভাবে পায়। অরুচি তার কিছুতেই নেই, আর অসম্ভ্রমের সংকোচ বা লজ্জা তারো অভাব,—প্রয়োজন নেই বলে,—

সম্ভ্রম—সেটা তার প্রাপ্যই। ছন্দাও নিজকে ঠিক সেই ছাঁচেই ঢালাই করে গড়ে তুলে—পার্টিতে যায় কথাও বলে দম না নিয়ে হেসে হেসে,—রুচিজ্ঞানের বালাই এসব ক্ষেত্রে নাইবা থাকলো, তবু হাজার মুখে তার রূপগুণের সুখ্যাতি আর আজ ধরে না। তার অনুপস্থিতি আজ সমবেত সকলেই মস্ত ক্ষতি বলে মনে করে—গোপনে প্রেম নিবেদন আর প্রশংসার পক্ষপাতিত্ব ও তার চোখ এড়ায়নি। এতেও একটা নেশা আছে আর এর লোভও সে ছাড়তে পারেনি; ফলে তারদিক থেকে চোখে পড়বার আগ্রহ সেটাও স্বাভাবিক। কি যে কার ভাগ্যে জুটেছে সেটা অবশ্য আর কারো জনবার কথা নয়। ছন্দার বুদ্ধিরও খ্যাতি আছে। সে যে সংসারের পথে জিতেছে তা'তে সন্দেহ করবার অবকাশই বা কোথায়?

ভালবাসায় নীহারের বিশ্বাস নেই—প্রেমের নামে সে হেসেই উঠে—বলে,—কল্পলোকের বস্তু কাব্যেই ফলুক—জীবনে এর অস্তিত্ব কোথায়—আর অবকাশেরও অভাব এবিষয়ে চিন্তার। তা' না হ'লে যে সে এ বিষয়ে তথ্য লিখতো ত'াতে যেন সন্দেহই করা চলে না। এর মাঝে সুন্দরের চেয়ে অসুন্দরটাই তার চোখে পড়ে বেশী। তাতে অবশ্য ছন্দারও বিশেষ কিছু আসে যায় না—আর সকলের চোখে যে সকল জিনিষ একই ভাবে ধরা পড়বে তারই বা কি কথা আছে?

নীহার আর যাই করুক তার স্বামিত্বের দাবি সে পুরোদমেই আদায় করে এসেছে আর ছন্দাও কোনদিন সেটা

অস্বীকার করেনি, নির্বিচারে মেনে নিয়েছে তার সে দাবি। হয় তো জীবনে এ রকমের স্বামীকে নিয়ে অসুবিধা আছে কিন্তু তার সুবিধেটুকু নিতেও সে ইতস্ততঃ করেনি। মোটের উপর বেশ আরামের ভিতর দিয়েই সে তার ছয়টি বছর কাটিয়ে দিয়েছে, আর তার একটি ছেলে আর একটি মেয়েও হয়েছে। ছেলেটি বড়ো চার বছর তার বয়স, দেখতে একটু রোগা আর দিন দিনই রোগা হচ্ছে যেন। মেয়েটি কিন্তু দেখতে তারি মতো—সুন্দরও, স্বাস্থ্যও ভাল,—দেড় বছরের মেয়ে বলে কেউ বিশ্বাসই করবে না! সবাই চেয়ে দেখে—বলে,—খাসা মেয়ে—

এ ছয় বছঁরে ছন্দার কিন্তু বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়নি। বয়স বাইশ তেইশ হ'লেও যেমন সে পনেরো বছর বয়সে ছিলো প্রায তেমনি আছে—তবে বেশভূষার পরিবর্ত্তন জীবনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে হতে বাধ্য আর চালচলনে পরিবর্ত্তন হওয়া স্বাভাবিকই। তাকে এবিষয়ে অনভ্যস্থতা কাটাতে একটুও চেষ্টা করতে হয়নি বললে হয়তো সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করা হবে না। তবে পনেরো বছরের ছন্দাকে আজ বাইশ বছরের এ রূপ-যৌবনমত্তা বিলাসিনীর মাঝ থেকে খুঁজে বের করা অভ্যস্থ চক্ষুর পক্ষেও কষ্টসাধ্য বই কি!

সেদিন এক পার্টিতে তারা গেলো এক বন্ধুর ওখানে। বিশেষ করে ছন্দাকে বলাও হয়েছে আর উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তাকেও সে ছোট করে দেখেনি; গেলো একটু বিশেষ করে সেজেগুজেই!

অনেকেই এসেছেন, আর নাচগান আমোদপ্রমোদেরও কোন ত্রুটি হয়নি। সবাই যখন সেধে এসে আলাপ করেছে আর তার একটু হাসিতে বা অঙুলের স্পর্শে নিজকে কৃতার্থ মনে করেছে তখন এককোণে যে একজন যুবক চুপ করে বসে থাকবে সেটা ছন্দার ভালো লাগলো না। নেশায় ভরা তার চোখে এই চব্বিশ পঁচিশ বছরের যুবককে খুবই সুন্দর লাগলো। পরিচয় পেয়েছে—নামকরা বড়লোক—সিভিল সার্ভিস পাশ করে এসেছে। যুবকটি মাঝে মাঝে তার দিকে চেয়ে দেখছিলো মাত্র। কিন্তু কি সুন্দর ওই লোকটিকে লাগছে,—ছন্দার আলাপ করতে খুবই ইচ্ছা হলো! মনে হলো,—লোকটি যেন তার চেনা—যেন তার অনুভূতির মাঝে এর পরিচয় লুকিয়ে আছে—কিন্তু কে সে সেটা তার কোন মতেই মনে পড়ছে না! সেধে সে আলাপ করতে গেলোনা—তার সঙ্গে এসে দুটো কথা বললে কিই ওর এমন সম্মানে বাধতো! যে লোক তাকে অগ্রাহ্য করছে তাকে অবজ্ঞা করে দেখিয়ে দিতে হবে তাদের দু'জনের তফাৎটা! ফলে বন্ধুবর্গের সঙ্গে তার সেদিনকার ব্যবহারটা একটু মাত্রা ছাড়িয়েও গেলো আর সকলের চোখও তার উপর বিশেষ করেই পড়লো,—আর সেটা সবচেয়ে বেশী নীহারেরই!

শেষটায় সবাই যখন বিদায় নিলেন ছন্দা আর নীহারও তখন মোটরে উঠছে। পাশের মোটরে উঠছে সেই যুবকটি। নীহার তাকে জিজ্ঞাসা করলো,—কবে যাচ্ছেন আপনি—

যুবক উত্তর দিলো:—কালই যাবো ভাবছি। এখানকার কাজও শেষ হয়ে এসেছে।

ছন্দা তার দিকে চেয়ে ছুরির মতো ধারাল শীর্ণ হাসি হেসে বললো,—আপনিই না কোণে বসে আমার দিকে চেয়ে দেখছিলেন ?—

যুবকটি তার মুখে চেয়ে উত্তর দিলো,—তোমাকেই দেখছিলাম ছন্দা,—তোমার মাঝে নারী জাতটাকে দেখবার চেষ্টা করছিলাম ! —চোখে তার অবজ্ঞা রূপ ধরে উঠলো নাকি ?

ছন্দা চমকে উঠলো—উঃ—এ ডাক তো তার অপরিচিত নয় ? সেই দীপু এই হয়েছে। তার সামনে পৃথিবীটা দুলে উঠলো—মাথা ঘুরছে !

মুখে ধারাল হাসি টেনে কণ্ঠে ব্যঙ্গ ঢেলে ছন্দা বললো,—বড্ড হতাশ হলে দীপু,—দেখাটা তোমার মিথ্যাই হলো—পেলে না কিছুই !

নীহার তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলো। দীপু আর কিছুই বললো না।

ছন্দা গাড়ীতে উঠে বসলো ; মাথাটা তার কেমন করছে—হাত পা অসাড় হিম হয়ে আসছে যেন—মনে কেমন একটা নির্লিপ্তের ভাব। পৃথিবীটা বন্ বন্ করে ঘুরছে—সব কিছু যেন ধ্বংসের অপেক্ষায় নিশ্চেষ্ট বসে—ছন্দাও ! গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলো—ছন্দা চমকে উঠলো—বজ্র নিয়তো ! গাড়ী ছুটে চললো, জগৎটা যেন বেগে ঘুরেছে—আরো বেগে ! শীতের ঠাণ্ডা হওয়া চোখে মুখে লাগছে—গালের উপরটায় চোখের কোণে কন্-কনে হাওয়ার অনুভূতি জ্বলছে—জ্বালা করছে ; তবু তাতে

একটা আরাম আছে—সে আরাম রক্তের মাঝে জ্বালা করার অনুভূতির আরাম! চারদিক নিথর আঁধারে ঢাকা—তারি মাঝে যেন কারা ছুটছে অস্পষ্ট আবছায়ার মতো! রাস্তার দু'পাশে ভেসে যাচ্ছে কাঠামোগুলো, পৃথিবীর নয়—প্রেত লোকের! আরো —আরো জোরে সব কিছু ঘুরছে; ছন্দা যেন নিশ্চেষ্ট নির্লিপ্ত অপেক্ষায় বসে! হঠাৎ ধাক্কা লাগলো—ওই ধ্বংসই বুঝিবা! —ছন্দার মন এক উন্মাদ আনন্দে ভরে উঠলো। সামনে চেয়ে দেখলো,—তাদের বাড়ী—গাড়ী থেমেছে।

নেমে সে উপরে উঠে গেলো। ক্লান্ত সে—বিছানায় শুয়ে পড়লো! বিছানায় শুয়ে সে ভাবতে লাগলো,—দীপুর সাথে তার ভাবই ছিলো সত্য, তবু সেটা যেন শুধু ভাবই নয়— তারো একটু বেশী—তবে কি সে সংসারের দাবায় জিততে গিয়ে হেরেই গেলো?

শ্রীহট্ট,
২৫শে অক্টোবর, ১৯৪১ইং

মানুষের চেয়ে বেশী—

সংসারে ঘটনাগুলো আমাদের ইচ্ছামত ঘটেনা, ঘটে যায় ঠিক গল্পের মতো। একটু তলিয়ে দেখলে জীবনটাকে একটা মিথ্যা গল্প বলেই মনে হয়। তবু তা সত্য নয়—জীবনটা জীবনই গল্পটা ভ্রম মাত্র।

গোপালের সঙ্গে দেখা হলো বারো বছর পরে পশ্চিমের এক সহরে। গোপাল বড়লোক—ধনী! তার বিষয়ে বিশেষ কিছু কেহই জানে না—যা' জানে সেটাও উপকথাই, আর সে উপকথার , রাজপুত্রের মতোই ধনী। আমি তাকে জানতাম,—জানতাম কেন জানি আজো,—আর আমার কাছে আপনারা যা' শুনবেন সেটা উপকথা নয়, সেটা সত্য—যা' আমি কাছে থেকে জেনেছি—যা' আর কেউ জানেনা।

গোপাল যে ঠিক কি ছিলো তা' বলে বুঝানো সম্ভব নয় ; সে ছিলো অদ্ভুত—সে ছিলো ব্যতিক্রম! মানুষকে আমরা যতো রকমে পাই সে ছিলো তার চেয়ে বেশী। সে ছিলো জীবনের এক নতুন ধরণের অভিব্যক্তি যা'কে ভাষা দিয়ে রূপ দেবার উপায় নেই। তার বিষয় বাড়িয়ে বলা সম্ভব নয়। কথাদিয়ে যতোটুকু বলা যায় তাতে তা'কে ধরা যায় না—তার সম্পূর্ণ মূর্ত্তি তাতে ধরে না, কাজেই বাড়িয়ে বলার দোষটা যে হবেনা তা নিশ্চয় করে বলা চলে। যতই বলিনা কেন তবু

তাকে বড়ো করে দেখানো তো দূরের কথা বাকিই রয়ে যাবে। ও জিনিষটা যে আমিই শুধু ভাবি তা' নয়, ওটা সকলেরই কথা—আর জগতে সত্যি এতো জিনিষ আছে যাকে ভাষা দিয়ে ফলিয়ে উঠা যায় না আর তা'ও সকলেই সমান ভাবে টের পেয়ে থাকবেন। মোটের উপর তাকে জীবনের এক নতুন অভিব্যক্তি বলে ঢেকে রাখা চলে কিন্তু তাকে পুরোপুরি কিছু-তেই দেখানো সম্ভব হয়না। অথচ রূপটা আমাদের অপরি-চিতও নয় আর তারো সুপ্ত মূর্ত্তিখানি যে আমাদের চেতনায় মিশে আছে তাও ঠিক তবু তার প্রকাশ হয়েছে একমাত্র গোপালের আত্মায়ই আর কোথাও দেখিনি; সে মূর্ত্ত জীবনের অনভিবক্তব্য রূপ—অসন্তুষ্ট এক বিরাট আত্মার প্রকাশ!

আমার বরাবরই তার উপর বিশ্বাস ছিলো আর কৌতূহল ছিলো তারো বেশী। আমি জানতাম জগৎটাকে সে এমন একভাবে দেখেছে যা' আর কেউ পারে না আর জীবনটাও তার কাছে আগাগোড়া হেঁয়ালীই নয়।

মৃত্যু নয় জীবন—বেঁচে থাকা, আর ওটা মানুষের বেঁচে থাকারই ইতিহাস। মরার পরেও আমাদের কল্পনা অনেক দূর অবধি যায় আর সেটাও আমাদের বেঁচে থাকবার ইচ্ছার প্রকাশই! মারা যাওয়ার পরও আমরা ধরে রাখতে চাই জীবনের একটু আভাস আর ইঙ্গিত, আর সত্যিই কি আমরা শুনতে পাইনা জীবনের কিনারায় মৃতের নিশ্বাস? তা'তে অবশ্য জীবনের কিছুই যায় আসে না--তাই রূপ পেয়ে বেঁচে

উঠে আমাদের কল্পনার স্বর্গরাজ্যে আর তারি উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে আমাদের চেতনা রাজ্যের দর্শন আর বিজ্ঞানের সাধনা। আসল কথা বেঁচে থাকা—আর এই বেঁচে থাকার রূপান্তর আমাদের চারদিকে ছড়ানো,—যে দিকে দু'চোখ যায়।

জীবনের ইতিহাস মোটেই সরল নয়। কেউবা বেঁচে থাকে কল্পনায় আবার কেউবা তা' হেসে উড়িয়ে দেয়। এমনি অসংখ্য ধরণের জীবনের ধারা চলে সংসারে আর সবাই ভাবে নিজের জীবনধারাটাই বাস্তব-ঘেসা। অবশ্য সেটা অস্বীকার করবারও কোন উপায় নেই—সকলের মতবাদই সমান সত্য—বাস্তবের স্বরূপটা ভিন্ন মাত্র। দেখবার বিচিত্র ভঙ্গিই এই বিচিত্র জীবন ধারার জন্য একমাত্র দায়ী।

গোপালের একসঙ্গে পড়েছি, তখন তার বয়স ছিলো ষোল। লেখাপড়ায় ছিলো খুবই ভালো আর মানুষটা ছিলো একেবারে অদ্ভুত। আমি তার চেয়ে বছর খানেকের ছোট আর বাবার ধনী বলে নামও আছে। আমিও ভালই ছিলাম পড়ায়। তাই বলে তার সঙ্গে নিজের তুলনা করছি ভাবলে ভুলই হবে ·· তার সঙ্গে আর কারো কোন তুলনা হয় না। আমাদের দু'-জনের বন্ধুত্ব ছিলো আর আমাদের দু'জনের উপরই শিক্ষকেরা অনেক কিছু আশাও করেছিলেন। কিন্তু স্কুলের শেষ পরীক্ষায় আমিই তাকে জিতে ফেললাম কারণ পরীক্ষা সে দিলই না। সেই যে সে কোথায় চলে গেলো বারো বছরের মাঝে তার কোন খবরই পাইনি।

গোপাল ছিলো গরীব, আর তার মা আর বোন ছাড়া কেহ যে কোথাও আছে সে কথা নিশ্চয় করে কেউই কিছু বলতে পারে না! সে থাকতো তার বোনের ওখানে—তার মাও। তার বোনের অবস্থা খুব ভালো না হলেও চলে যায় এমন। গোপাল খুব ভালো লিখতে পারতো—কবিতাই বলো আর গদ্যই বলো। লেখবার ক্ষমতাটা ছিলো তার অদ্ভুত যেন জন্মান্তরের পাওয়া। আমরা ভাবতাম যদি ওরকম লিখতে পারি তা বর্ত্তে যাই—চেষ্টাও করতাম। অনেকেই হাসতো, শুধু গোপাল বলতো, —অমি, তুই লিখে যা ভাই, ওসব তোদেরই সাজে; দেখে নিস্, একদিন তোর হাত সত্যি খুলবে আর সেদিন ওঁরা অবাক্ হয়ে তোর দিকে চেয়ে দেখবে! তার সে ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে কিনা জানিনা, তবে সে সময় তার এ কথাগুলো শুনে যে সত্যি খুব খুশি হয়ে উঠতুম আর কাগজের পর কাগজ যা' তা' লেখায় ভরে উঠতো সে কথা ঠিক। যা' তা' বলছি কারণ বয়সের সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে—সে দিনের সে লেখাকে আজ আমার তা'ই মনে হয়, আর সত্যি কথা বলতে কি লেখাগুলো পুরানো হয়ে গেলে তা' যা'-তা'ই হয়ে উঠে! বোধ হয় ওখানেই সে আমাকে জয় করেছিলো, নইলে আমার মতো জেদী ছেলের সঙ্গে সহজে বনিবনাও হওয়া মোটেই সম্ভব ছিল না। সে সত্যি দরদী ছিলো।

একখানা কবিতা লিখে খুশি হয়ে গেলুম তাকে দেখাতে। সে বললো,—দেখ্ অমি,—ওসব লেখা আমি কিছু বুঝিনে,—

আমার মনে হয় অলস মস্তিষ্কের মিথ্যা কল্পনা ওসব—জীবনের সঙ্গে ওগুলোর মোটে সঙ্গতি নেই, খাপছাড়া মনোবৃত্তির খেযালে ওসব গড়ে উঠে—

আমি তাকে বললাম,—বলিস কি গোপাল, তুই শিক্ষা সংস্কৃতি সব কিছুকে অস্বীকার করিস্ ?—আর ওসবের যদি কোন মূল্যই নেই তবে তুই ওসব লিখিস কেন ?

—ওসব পাগলামী আমি ছেড়ে দিয়েছি,—বলে সে হাসলো —আমার মনে হলো এতো হাসি নয়!—তার লিখা ছেড়ে দেওয়ার অর্থ যে কি—কতোটুকু মূল্য এজন্য তাকে দিতে হলো সেটা আর কেউ না বুঝলেও আমি বুঝি! তারপর সে বললো, —দেখ্,—আমি এখন কঠোর বাস্তব নিয়ে ব্যস্ত—তোদের মতো ধনীদেরই ওসব বিলাস পোষায় ভাই,—

মনে আমার কষ্ট হলো,—তার জন্যও তার কথার জন্যও—

তারপর কেমন ধীরে ধীরে সে বদলে গেলো। লেখাপড়া তাকে বিশেষ করতে কোনদিনই দেখিনি, এবার সেটা একেবারেই ছেড়ে দিলো। তারপর পরীক্ষার কিছুদিন আগে পরীক্ষা না দিয়েই সেই যে বেরিয়ে গেলো আর এই তার সঙ্গে দেখা।

আজ মনে পড়ে সে চলে যাবার আগের একদিনের কথা। কথাগুলো সে বলেছিলো কিন্তু সে দিন তার ঠিক ঠিক অর্থ বুঝিনি ; আজ কিন্তু তার অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেছে আমার! সত্যিকার মানুষের আত্মা কোনদিন সুখী হতে পারে না—

অসন্তোষ যে সেখানে জমা হয়েই আছে। মানুষের সে চিরন্তন বুভুক্ষার নিবৃত্তি কোথায়?

সে বলে ছিলো,—দেখ অমি, জীবনে দুঃখটাই সত্য সুখটা আমাদের দেখবার ভ্রম মাত্র,—সুখ বলে সত্যি কিছু নেই। আর তা' যদিই বা থাকে তবু তা' এতো ক্ষণস্থায়ী যে একটু পরেই তার জন্য আমাদের দুঃখ দিয়ে মূল্য দিতে হয় সহস্রগুণ! তাইতো জগতে যতো নাটক আছে সবগুলিই বিয়োগান্ত আর তা' আমাদের রক্তে মিশে আছে বলেই তো সেগুলো আমাদের এতো ভালো লাগে। এর মাঝে চোখের জলের চেয়ে কিন্তু আনন্দই বেশী আছে—দুঃখ আমাদিগকে সত্যিকার আনন্দই দেয়। কতো ভালো লাগে যখন শুনি জগতের চারদিকে শুধু কান্না আর হা-হুতাশ—বাতাসে মানুষের দীর্ঘশ্বাস জমাট বেধে আছে যেন! তা' জমা হয়ে আসছে মানুষের আরম্ভ থেকে আর জমা হতে থাকবেও। একটু কান পাতলেই তা' শুনবি—মনটা কিন্তু তাতে খুশিই হবে। এই ই হ'লো জগতের সত্যি-কার রূপ,—বুঝলি!—

কান্না আর হা-হুতাশ শুনে আনন্দ পাই—কেমন খারাপ শোনায় নাকি; তবু তাই হয়তো সত্য আর তার বলবার এমন একটা ক্ষমতা রয়ে গেছে, যা' শুধু মুগ্ধই করে না, যা' শুনলে মনে হয়,—সত্যি তাই!—মনে মনে বললাম,—অদ্ভুত! বাস্ত-বিকই সে ছিলো অদ্ভুত—অনেক সময় তাকে ঠিক ঠিক বুঝা যেতো না; কিন্তু তার কথার মাঝে এমন একটা জোর ছিলো

যা শুনে কিছু না বুঝলেও আর কারো কিছু বলবার বা প্রতিবাদ করবার সাহস থাকতো না—হাসাতো দূরের কথা! সবাই অবাক হয়ে চেয়ে রইতো তার মুখে শুধু—

মানুষকে আমরা তখনই সম্মান দেই যখন তার মাঝে এমন একটা কিছু দেখি যা' আর দশজনের মাঝে নেই—যেখানে সে একক, আর দশজন হতে বড়ো। সব সময়ই যে আমরা তা' জানি এমনও নয়, অনেক সময় বুঝতে পারি না...জানিই না কোথায় তার নিজস্ব প্রধান্য লুকিয়ে আছে আমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে, অথচ আমাদের মাথা তার সামনে আগোচরে নুয়ে পড়ে। এমনি ছিলো গোপাল, যার কাছে আপনা থেকে মাথা নত হয়ে আসতো—আমরা তার প্রাধান্য মেনে নিতাম, অথচ জানতাম না কোথায় সে আমাদের চেয়ে বড়ো। সে ছিলো নিজস্ব—মতে আর পথে,—ধারকরা সে ছিলো না। অর্থাৎ বিপদ তাকে নিয়ে নয় যার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে,—বিপদ তাকে নিয়েই যে ধারকরা—যা'র মাঝে নিজের বল্‌তে সত্যি কিছু নেই,—আমাদের মানা না মানায় কিছু যায় আসে না।

আপাততঃ এখানেই আমাদের পুরানো কথার শেষ করে ফেলি—যদিও অনেক বললেও সেটা শেষ হবার নয়।

পশ্চিমের এক সহরে আমার এক বন্ধু কাজ করেন। সহরটার স্বাস্থ্যের খ্যাতি আছে দেশজোড়া। বন্ধুর তাগিদে আমাকে আমাকে সেখানে যেতে হলো। যে কয়দিন রইলাম শুনলাম

শুধু একটি মানুষেরই কথা—কতোরকমের আলোচনা তার বিষয়, যেন সেখানে একমাত্র আশ্চর্য্য হলো এই লোকটিই—পৃথিবীর আশ্চর্য্যের অন্যতম—যাকে বাদ দিলে সবটাই ফাঁক পড়ে যায় এমনি! মনে হলো,—এতো মানুষ নয়?—মনে কৌতূহল জাগলো—এঁকে জানতেই হবে। এই অন্যতম আশ্চর্য্য ব্যক্তিটি—মিঃ গোপাল।

বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন,—অদ্ভুত মানুষ—ওযে কি কেউ জানে না! সবাই তাঁকে ভয়ও করে ভক্তিও করে। অসাধ্য বলে এঁর কাছে কিছু নেই—নেপোলিয়নের যুগ হলে হিমালয়কে মাটিতেই মিশতে হতো। এমন কোন ভাষা বোধহয় নেই যা' উনি না জানেন আর দেখতেও লোকটি এমন যে তাঁর জাতিনির্ণয় করার কোন উপায় নেই। তা' ছাড়া তাঁর বিষয় নানা ধরণের জনশ্রুতিও আছে।

মিঃ গোপালের কথা তিনি আরো যা' বললেন সেটাও লোকেরই কাছে শোনা কথা আর তা' এই ঃ—

সেখানকার এক বড়ো ব্যবসায়ী—নাম ছিল তার রাজন। তার পতনের ইতিহাসে মিকি নামে একটি পার্শী মেয়ে জড়িত। একদিন মেয়েটি চলে গেলো। সে নাকি চলে যায় রাজনের সারা জীবনের সঞ্চয় নিয়ে। ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর আর মন দুইই পড়লো ভেঙে। ঠিক সেই সময় মিঃ গোপাল মিকিকে নিয়ে এলো—কেমনে করে আর কোথায় যে মিকির সঙ্গে তার পরিচয় তা' কেউই জানেনা। পরের চার বছরে মিঃ

গোপাল তার ব্যবসাকে গড়ে তুললো। মেয়েটি আজো সেখানে আছে কিন্তু রাজন আজ আর নেই। মিঃ গোপাল নিশ্চয় যাদু জানে নইলে সে মিকিকে কি করে পেলে,—মিকিও রইলো আর ব্যবসাও! আজ সে অনেকগুলো কারবারের মালিক—সেগুলো সে যেন যাদুবলে গড়ে তুলেছে আর মিকি তারি বিবাহিতা স্ত্রী।

আমার মনে হলো লোকটি যেন আমার চেনা। বন্ধুকে বললাম,—লোকটি অদ্ভুত, দেখতে ভারি ইচ্ছা করে—চলনা একদিন তার সঙ্গে দেখা করে আসি

সে বন্দোবস্ত তিনি করলেন। ঠিক হলো পরদিন বিকেল বেলা আমরা যাবো।

গিয়ে দেখলাম একজন ভদ্রলোক আরাম কেদারায় বসো পরণে সাহেবের বেশ—হাতে চুরুট—কোলের উপর কতকগুলো কাগজপত্র। উজ্জ্বল চোখ, দেখে মনে হয় বয়স সাতাশ আটাশ; মাথায় বড়ো বড়ো চুলে পাক ধরেছে; দেখে আমার মোটেই চেনা মনে হলোনা।

আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠলেন, বললেন,—বসো আমি,—আমি চমকে উঠলাম। গোপাল —তুই?—বলে তার গলা জড়িয়ে ধরলাম।

গোপাল বললো,—আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই ভাই,—আমাদের বেঁচে থাকাটা কি এরো চেয়ে আশ্চর্য্য নয়?

কিছুক্ষণ পরে মিকির সঙ্গে পরিচয় হলো। তাকে দেখলাম—চমকাবার মতো কিছু নয়—তবু সে সুন্দর! ছোট্ট মুখ—শরীরটা হালকা একটু ঢেঙা,—মাংস কম—হাড় দেখা না গেলেও অনুমান করা যায়! তবু তা'কে বড়ো সুন্দর মনে হলো—বড়ো বড়ো চোখ দুটি কালো—আলো ঠিকরে পড়ছে যেন! এতো সুন্দর মেয়ে আমি কোন দিন দেখিনি,—গায়ের রঙ্ তুলনা দিয়ে বুঝানো সম্ভব নয়। বয়স চব্বিশ পঁচিশ হতে পারে, তবে সেটা ঠিক বুঝা যায় না—শরীরের মধ্যে কোন জায়গায় তা' গোপনে বাসা বেঁধেছে সেটা বুঝবার জোটি নেই,—যেন বয়সটা ওরি ইচ্ছামত আনাগোণা করছে—/পনেরো, পঁচিশ, পয়ত্রিশ যা' খুশি বলতে পারো, কিছু যায় আসে না। মিকি হয়তো আমার দৃষ্টি অনুভব করে মৃদু হাসলো কৌতূহলের হাসি। শুধু গোপাল বললো,—

—ওরা ওই!—একটা কথা মনে রাখিস্ অমি,—যে সব-কিছুর মূলে ওরা বসে রয়েছে নীরবে—আজ অবধি জগতে যা' কিছু সব ওরাই করেছে। পুরুষের মনের উপর প্রভুত্ব ওদের দাবি আর সেটা আমরা অস্বীকারও করতে পারিনা—সেটা ওদের একেবারে আদিকাল থেকে পাওয়া প্রকৃতির দান। ও জিনিষটাকে অস্বীকার করতে গেলেই হারতে হয়। আমরা তা'কে জয় করতে চেয়েছি সত্যি—কিন্তু তা' তার আদিম রূপটা অবধি বদলায়নি—বার বার আমরা হেরে গেছি। ওটা মেয়েদের প্রশংসা নয়—পুরুষের হীনতা,—দৈন্য! আমি এ

জানি তাই হয়তো মিকির উপর আমার এ জোর, আর তা'কে পাওয়াও আমার এটা জানারি ইতিহাস। সেটা তোকে আর একদিন বলবো।

আমি তা'দের ছু'জনেরই দিকে চেয়ে দেখলাম,—তারা হাসছে।

তা'দের দাম্পত্যজীবনটা যে সুখের তা' টের পেলেও সেটা আমার বিষয়-বস্তুর বাইরে। যা' আমার বিষয়-বস্তুর বাইরে সেটাকে নিয়ে টানাটানি আমার অভ্যেস নয়। তবু আমি মিকির দিকে চেয়ে দেখলাম,—কি আছে ওর মাঝে যা' এই অদ্ভুত মানুষটাকে পোষ মানালো,—ধরে রাখলো অসন্তুষ্ট এক অস্থির আত্মাকে,—সে কোন শক্তি? হয়তো গোপালের কথাই ঠিক—এ-ই নারী জাতির রূপ! তবু কেমন একটা আশংকা জাগলো,—তাদের এ ঘরের ভিতে ফাটল রয়ে গেছে—চোরাবালির গাঁথনি দিয়ে ঢাকা। কে জানে আমার এ সংশয় অহেতুক ও তো হ'তে পারে?

বন্ধু আমার চলে গেলেন—কাজ আছে তার! গোপাল আমাকে ছেড়ে দিলোনা—রাতে ওখানে খেয়ে যেতে হবে! সন্ধ্যার আগটায় গোপাল বললো,—

—চল অমি, একটু ঘুরে আসি!—

মোটরে ছু'জন বেরিয়ে গেলাম, মিকি কিছুতেই যেতে রাজি হলোনা। গোপাল মোটর চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—একটু

পরে আমরা সহর ছেড়ে এগিয়ে চললাম কাঁখর ভরা পথে। চারদিকে আবছায়া নেমেছে কুয়াসার মতো। একটি ছোট পাহাড়ের ধারে মোটর থামিয়ে গোপাল নেমে পড়লো—তারপর ভাঙা ছোট ছোট লাল পাথরের সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলো—আমিও গেলাম। সেখানে এক পুরাতন ভাঙা মন্দিরের সামনে বসে পড়লাম আমরা। মন্দিরটিতে এক কালে দেবতা ছিলেন—হয়তো খুব জাগ্রত! কালের গতিতে তার চিহ্ন হিসেবে আজ দাঁড়িয়ে আছে শুধু মন্দিরটি—অনেক অনেক আগের। কপাট নেই—ভেতরটা আঁধারে ঠাহর করা যায় না—জন্তু জানোয়ারের আড্ডা হতে পারে। কিন্তু সে দিনের সে জাগ্রত দেবতার নিঃশ্বাস চারদিকে ব্যাপ্ত হয়ে আছে যেন—আমি শুনছি!

গোপাল সেখানে বসে চুরুট ধরালো,—তারপর আমাকে বললো,—মিকিকে দেখলি—কেমন লাগলো—

বললাম,—ভালোই তো—সুন্দর তার সব কিছুই—বাস্তবিকই সে সুন্দর—তাকে ভালো না লাগাই তো আশ্চর্য্য—

গোপাল যেন আমারি কথার প্রতিধ্বনি করে বললো,—আশ্চর্য্য—অদ্ভুত মেয়ে সে—তার পরে চুপ করে চুরুটে টান দিতে লাগলো আর তাকিয়ে দেখতে লাগলো ধোঁয়ার দিকে মনোযোগের সহিত হয়তো তা' কেমন লাগে—

আমি মনে মনে বললাম,—অদ্ভুত না হলে তোর মতো অদ্ভুত লোককে ধরে রাখবে কেন?

ধীরে ধীরে রাতের আঁধার ধরণীকে ঢেকে দিতে লাগলো,—নীচে পথের উপর মোটর খানা হারিয়ে গেলো তারি মাঝে। গোপাল সেই আঁধারের দিকে তাকিয়ে বসে। পাশ দিয়ে একটা শেয়াল চলে গেল বুঝি—তারি পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আকাশে তারা ফুটে উঠছে একটি একটি করে,—আমার মনে হলো তারাগুলি যেন আমার অচেনা। অচেনা আবেষ্টনীতে হয়তো তাই মনে হয়—মনে হয় কিছুই যেন আমার পরিচিত নয়—আমি পথ হারিয়ে এখানে এসেছি পথিক—আর এখানকার সব কিছু অপরিচয়ের দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে; গোপালের দিকে চেয়ে দেখলাম,—সে দূরে চেয়ে বসে,—তাকেও যেন আমি চিনতে পারছিনা—সেও যেন আমার অচেনাই!

গোপাল আমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললো,—অমি, আমি খুব সুখী না-রে?—তার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

আমি বুঝতে পারলাম না কেন সে এ কথা বললো—চেয়ে রইলাম তার মুখে—

গোপাল বলে চললো,—দেখ অমি, বাস্তবিক আমি সুখী, সংসারে যা' প্রয়োজন তার সবই আমি পেয়েছি,—তবু আমার কি মনে হয় জানিস্—

আমি বললাম,—কি মনে হয়?

—মনে হয় যেন আমি সত্যি সুখী নই,—গোপাল বলে চললো,—সংসারে সম্পদ পেয়েছি, গড়ে তুলেছি একটার পর

একটা ব্যবসা—যা' যে কোন মুহূর্ত্তে ধ্বসে পড়তে পারে, তলিয়ে যেতে পারে,—আর তা' হয়তো যাবেও একদিন! খেয়ালের উপর অনেক কিছুই করে চলেছি,—আমার মনে হয় এ এক খেলা খেলছি—যা' আমার নয়—আমি সাক্ষী মাত্র! যা' শেষ হয়ে যাবে—শেষ করে দিতে ইচ্ছে হয়—পড়ুক না ধ্বসে! এটুকু জীবন থেকে যদি খসে পড়ে কতোটুকুই ক্ষতি তাতে—পড়লোই বা! কিন্তু আমার এ ইচ্ছাটাকে আটকে রাখতে হয়—হয়তো এও খেয়াল তবু তাকে দাবিয়ে রাখতে হয়,—কিন্তু তা' থাকবেনা অমি, তার শেষ একদিন হয়েই যাবে। মিকির দিকে চেয়ে আমার দুঃখ হয়,—সত্যি সে খুবই ভালো; তবু আমার কি মনে হয় জানিস,—আমাকে ধরে রাখবার মতো জোর বোধ হয় তার মাঝে নেই,—সে এতো ভালো না হলেও পারতো! একদিন সে এবাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিলো,—সেদিন তাকে আমিই ফিরিয়ে আনি আমার প্রয়োজনে! তারপর আরেকদিন দেখলাম,—সে এখানে শিকড় গেড়েছে—এখান থেকে তার আর চলে যাবার আজ উপায় নেই। নিজের দিকটা আগে তলিয়ে দেখিনি, যখন দেখলাম মনে হলো আমিও দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। সত্যি হয়তো আমি দুর্ব্বল হয়েই পড়েছি অমি,—কিন্তু তোরা যেমন দেখিস সত্যি আমি তেমন নই! আমি জীবনকে ঠিক সাধারণ ভাবে পাইনি—এতো সত্ত্বেও আমার মন সুখী হতে পারেনি—আমার অস্থির আত্মা অস্থিরই রয়ে গেলো। পাওয়ার যোগ্যতা

আমার আছে কিন্তু নেবার যোগ্যতা হয়তো নেই। সব কিছুতে ফাঁক রয়ে গেছে অমি,—যে ফাঁকে আমি ভেঙে পড়বো আর ভেঙে পড়বে সব কিছুই ; হয়তো তা'তে আমি খুশিই হবো···সে হঠাৎ থেমে গেলো আর চেয়ে রইলো আঁধারের মাঝে—

আমার দীর্ঘশ্বাস পড়লো। দূরের ওই তারাটা যেন আমার অচেনা—কোনদিনই সেটাকে আমি চিনিনি—সব কিছুই আমার চিরদিনের অপরিচিত !

শ্রীহট্ট,
২৯শে অক্টোবর, ১৯৪১ইং।

শেষ